মে ২০২৫

বিজ্ঞানচিন্তা

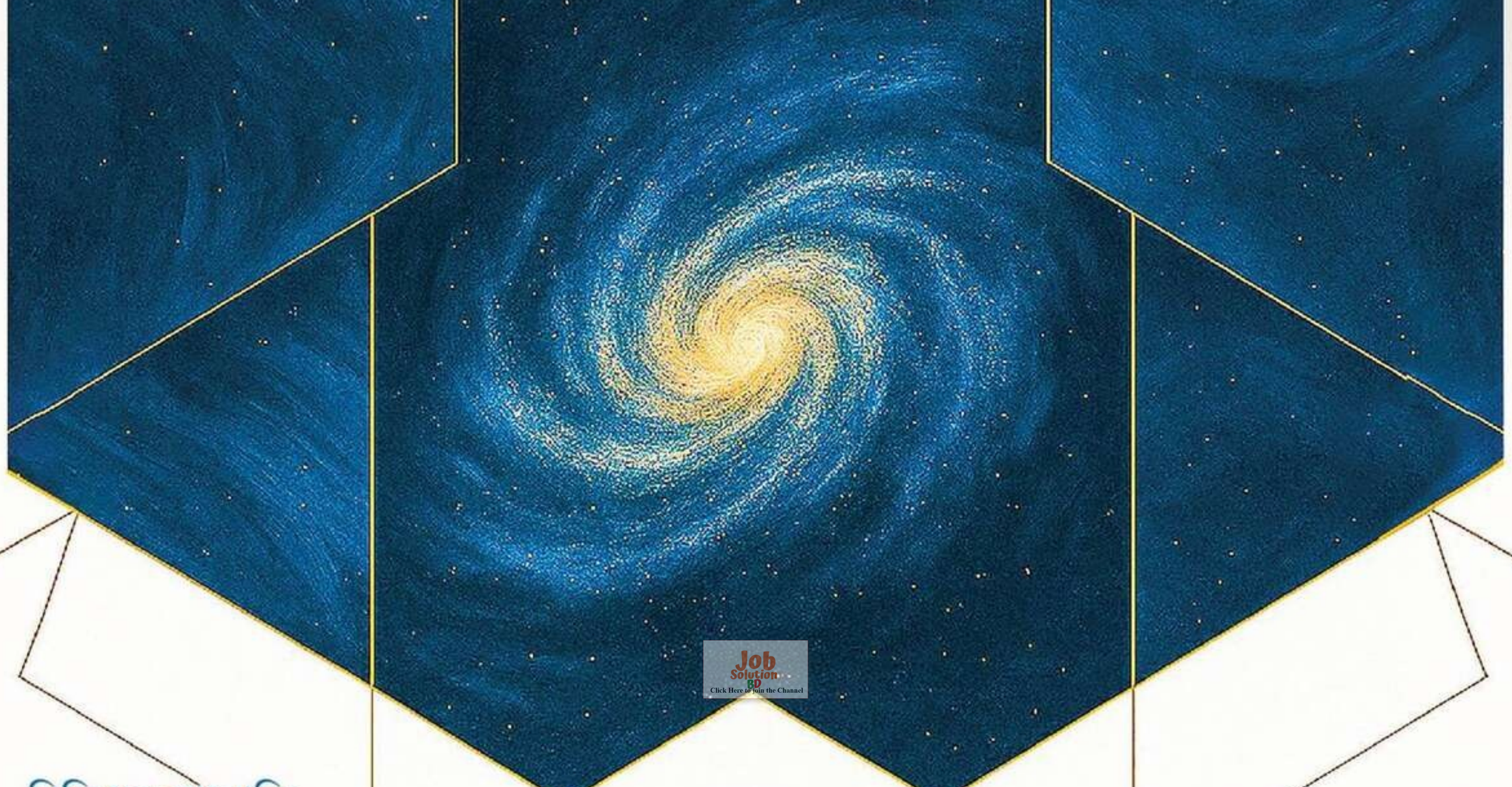

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি

আমাদের মহাজাগতিক ঠিকানা

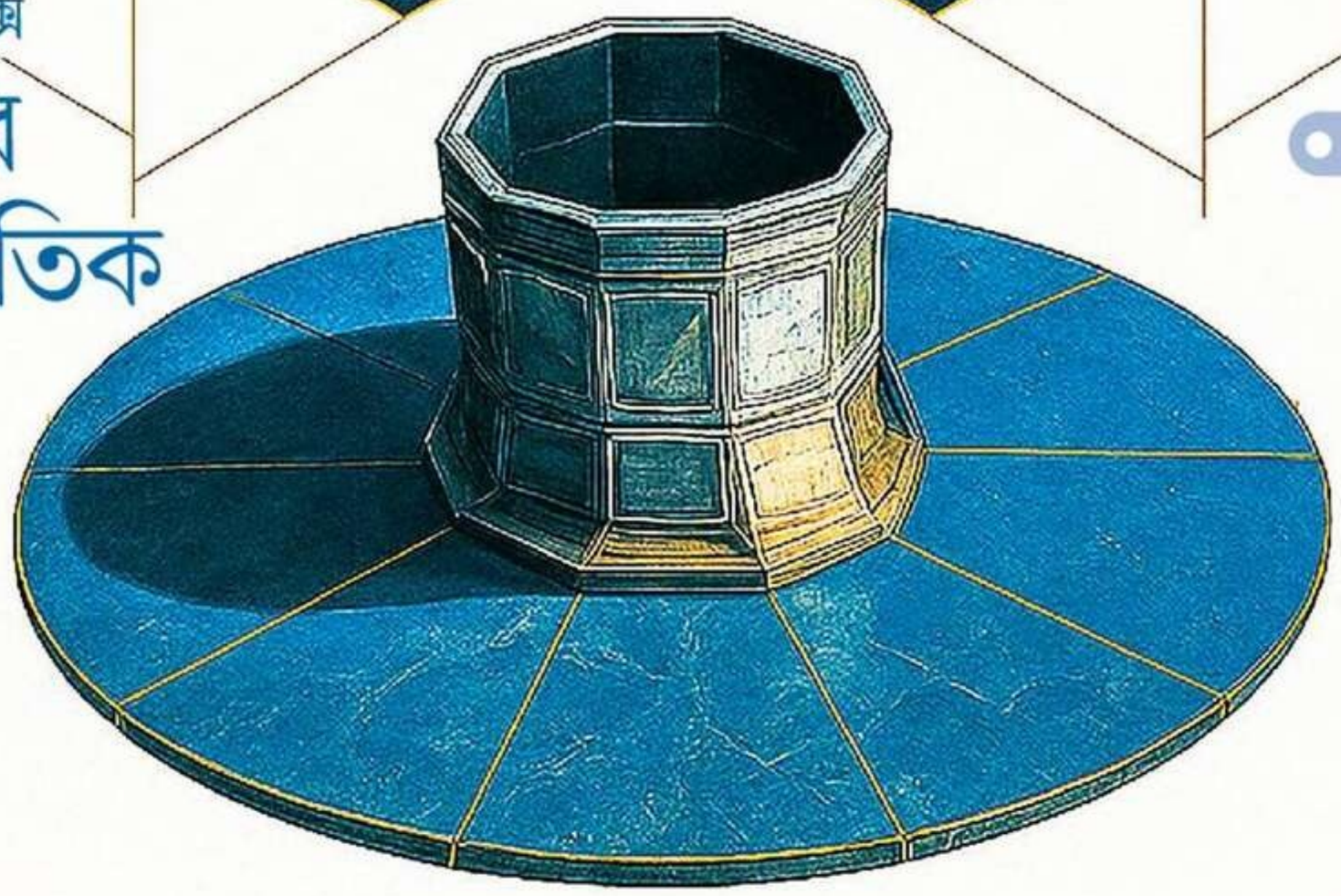

সাক্ষাৎকার

সুনিতা উইলিয়ামস
নভোচারী, নাসা

স্ট্রিং থিওরির গোড়ার কথা

ধন্যবাদ চ্যাটজিপিটি, লাভ-ক্ষতির খতিয়ান

বিজ্ঞান কল্পগল্প, রম্য ছড়া, কমিক, কার্যকারণ

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

citytouch
DIGITAL BANKING

city bank
making sense of money

ব্যাংকিংয়ের সব এক অ্যাপেই সম্ভব

সকল ব্যাংকিং সেবার ওয়ানস্টপ সল্যুশন সিটিটাচ। ফান্ড ট্রান্সফার থেকে শুরু করে ডিপিএস, ফিক্সড ডিপোজিটসহ প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যাংকিং করতে পারবেন মাত্র কয়েকটা ট্যাপেই। তাই আজই খুলে ফেলুন সিটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর সিটিটাচ অ্যাপ ডাউনলোড করে উপভোগ করুন ব্যাংকিংয়ের সকল সুবিধা। ***সিটিটাচ হাতে, ব্যাংকিং সাথে সাথে।***

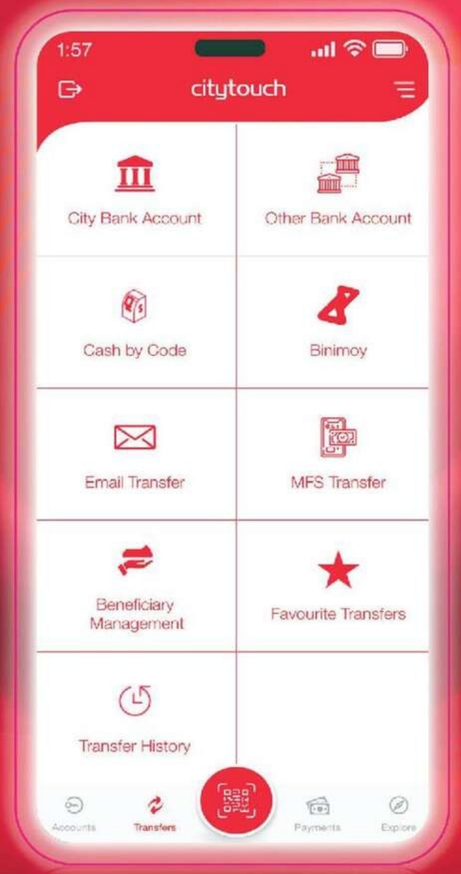

সিটিটাচ ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন

ডাউনলোড করুন

citytouch | GET IT ON Google Play | EXPLORE IT ON AppGallery | Available on the App Store

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

FOBEITOP1/24

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

ENVOY TEXTILES LIMITED

- WORLD'S FIRST LEED CERTIFIED PLATINUM DENIM MILL
- FIRST ROPE-DYEING TECHNOLOGY IN BANGLADESH
- FIRST ECO LAB IN BANGLADESH IN STRATEGIC PARTNERSHIP WITH JEANOLOGIA
- 11-TIME WINNER OF NATIONAL EXPORT TROPHY
- WINNER OF NATIONAL ENVIRONMENTAL AWARD
- 3-TIME WINNER OF PRESIDENT'S INDUSTRIAL DEVELOPMENT AWARD
- MULTIPLE-TIME WINNER OF HIGHEST TAXPAYER AWARD
- 2-TIME WINNER OF HSBC EXPORT EXCELLENCE AWARD
- LAB ACCREDITATION BY RENOWNED BRANDS LIKE LEVI'S, KONTOOR, AMERICAN EAGLE, JCREW, VF, RALPH LAUREN, TARGET, etc.

amfori BSCI Trade with purpose
amfori BEPI Trade with purpose
OEKO TEX®
ROADMAP TO ZERO
GOTS - Global Organic Testing Standard
GRS - Global Recycled Standard
OCS - Organic Content Standard
RCS - Recycled Claim Standard
SOCIAL & LABOR CONVERGENCE
investing in better cotton
COTTON USA™ THE COTTON THE WORLD TRUSTS
COTTON MADE IN AFRICA

EXPORTING WORLDWIDE

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS · LEVI'S · KONTOOR · INDITEX · UNIQLO · target
BESTSELLER · H&M · J.CREW · C&A · Calvin Klein · COTTON:ON
Walmart · vf · TESCO · GAP · Carrefour · s.Oliver
LC WAIKIKI · JCPenney · next · Kmart · RALPH LAUREN · UNITED COLORS OF BENETTON.

www.envoytextiles.com

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

সম্পাদকীয়

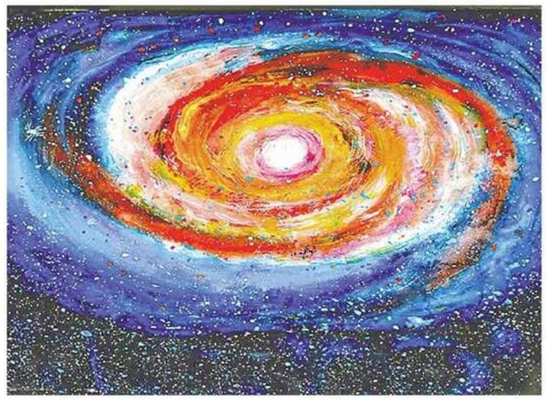

আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি

আমাদের মহাবিশ্বটা কত বড়? এককালে মানুষ ভাবত, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিটাই গোটা মহাবিশ্ব। মাত্র গত শতকে মার্কিন জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল প্রমাণ করেন যে মহাবিশ্বের হাজার কোটি গ্যালাক্সির মতো মিল্কিওয়ে একটি গ্যালাক্সিমাত্র। আজ আমরা জানি, মিল্কিওয়ে আমাদের মাতৃগ্যালাক্সি। কিন্তু এই গ্যালাক্সির আকার কেমন, ভর কত? কেন এর কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে এত সব গ্রহ-নক্ষত্র?

মহাজাগতিক এসব রহস্যের সমাধানের পথে বড় অগ্রগতি হয়েছিল টেলিস্কোপ আবিষ্কারের মাধ্যমে। ২০১৩ সালে ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসা মিল্কিওয়ের ইতিহাস এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব পেতে গায়া টেলিস্কোপ পাঠায় মহাকাশে। সম্প্রতি এই টেলিস্কোপের কার্যক্ষমতা শেষ হয়েছে। এই টেলিস্কোপের তথ্য থেকে বিজ্ঞানীরা মিল্কিওয়ের ত্রিমাত্রিক মানচিত্র তৈরি করেছেন, ভর নির্ণয় করেছেন, মিলেছে আরও বহু প্রশ্নের উত্তর। এই টেলিস্কোপের তথ্য থেকে লেখা হয়েছে ১৩ হাজারের বেশি গবেষণাপত্র। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিকে জানার এই প্রচেষ্টা এবং মিল্কিওয়ের নানা রহস্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিয়ে এবারের সংখ্যা।

সার্নের লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারের কথা হয়তো শুনেছেন। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কণাত্বরক যন্ত্র। কেমন করে সূচনা হলো এ ধরনের কণাত্বরক যন্ত্রের? এর প্রয়োজনই-বা পড়ল কেন? পরমাণুর ভেতরে উঁকি দেওয়ার সেই প্রচেষ্টা জানতে পারবেন এ সংখ্যায়। জানতে পারবেন স্ট্রিং থিওরির নেপথ্যের নায়কদের কথা, তত্ত্বটির প্রয়োজনীয়তা। মহাবিশ্বের শুরুর দিকে প্ল্যাঙ্ক স্কেলের পরিসরে আমাদের জানা পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো কেন অকার্যকর হয়ে পড়ে, এ নিয়ে থাকছে একটি ফিচার। কোয়ান্টাম মেকানিকসের বিখ্যাত শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল নিয়েও একটি লেখা থাকছে। নভোচারী সুনিতা উইলিয়ামসের সাক্ষাৎকার, নানা স্বাদের একগুচ্ছ মজার ফিচার, বিভিন্ন ধরনের কুইজ ও ধাঁধা, বিজ্ঞান ছড়া, রম্য, দুটি কমিকস, কার্যকারণ, বিজ্ঞান কল্পগল্পসহ নিয়মিত সব আয়োজন তো থাকছেই।

বিজ্ঞানচিন্তার পরের সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে ঈদের পর। সবার সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার পাশাপাশি পরিবেশের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তা ছাড়া গরমের এ সময় অনেকেই জ্বরে ভোগেন। এ জন্য আমাদের সবারই একটু সাবধানে থাকা দরকার।

সবাইকে ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা।

বিজ্ঞানচিন্তা

মে ২০২৫
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
বর্ষ ৯ সংখ্যা ০৮
পঞ্চাশ টাকা

সম্পাদক
আব্দুল কাইয়ুম

উপদেষ্টা পরিষদ
ড. রেজাউর রহমান
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. জেবা ইসলাম সেরাজ
ড. আরশাদ মোমেন
ড. মাহবুব মজুমদার
মুনির হাসান

নির্বাহী সম্পাদক
আবুল বাসার

সহসম্পাদক
উচ্ছ্বাস তৌসিফ
কাজী আকাশ

বিশেষ সহযোগী
রাজীব হাসান

সম্পাদনা দল
ইবরাহিম মুদ্দাসসের

ম্যাগাজিন সমন্বয়ক
শাহাদাত ফয়েজ ওয়াইসি

বিপণন ব্যবস্থাপনা
মো. মহিউদ্দিন রওনক

শিল্প নির্দেশনা
সৈয়দ লতিফ হোসাইন

ডিজাইন
আপন জোয়ার্দার

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
শামসুল হক

প্রচ্ছদ : এআই আর্ট

সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রসারে সহযোগিতায়
সিটি ব্যাংক™

প্রকাশক আব্দুল কাইয়ুম কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ : বিজ্ঞানচিন্তা, প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩। ফ্যাক্স : ৯১২১০৫২।
ওয়েবসাইট : bigganchinta.com
ই-মেইল : editor@bigganchinta.com
ফেসবুক : facebook.com/Bigganchinta

পরিবেশক : প্রথমা
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

সূচিপত্র

মলাট কাহিনি

মিল্কিওয়ে আমাদের মহাজাগতিক বাসস্থান। মহাবিশ্বের হাজার কোটি গ্যালাক্সির ভিড়ে এটি ‘আমাদের গ্যালাক্সি’, একান্ত আপন। এই গ্যালাক্সির নানা রহস্য ভেদ করার কাহিনি, বিজ্ঞানচর্চার হাজার বছরের ইতিহাস...

আমাদের মহাজাগতিক ঠিকানা
প্রদীপ দেব ১৪

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি ২০

মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থান ২২

গায়া টেলিস্কোপ : মিল্কিওয়ে রহস্য সমাধানে বিপ্লব
ইশতিয়াক আকিব ২৪

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র ৩০

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

বিজ্ঞান কল্পগল্প

পৃথিবী বদলে গেছে
মোহাইমিনুল ইসলাম বাপ্পী ৫৬

সাগরতল থেকে আসার পর থেকে পল্লব যেন একদম অচেনা মানুষে পরিণত হয়েছে। আগে খুব বকবক করত। কাজ থেকে ফিরে কী হয়েছে না হয়েছে, সব উগরে দিত বিদিতার কাছে। এখন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে নিজের ভেতর। প্রয়োজনের বেশি কোনো শব্দ খরচ করছে না। থাকছে চুপচাপ, নিজের ভেতর। কেন?

বিজ্ঞান রম্য

বিজ্ঞানমনস্ক ছেলেবন্ধু
আহসান হাবীব ১১

বিজ্ঞানমনস্ক এক মেয়ের খুব শখ, তার একটা ছেলেবন্ধু হবে। তার সঙ্গে সে সুন্দর সময় কাটাবে, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার নিয়ে কথা...

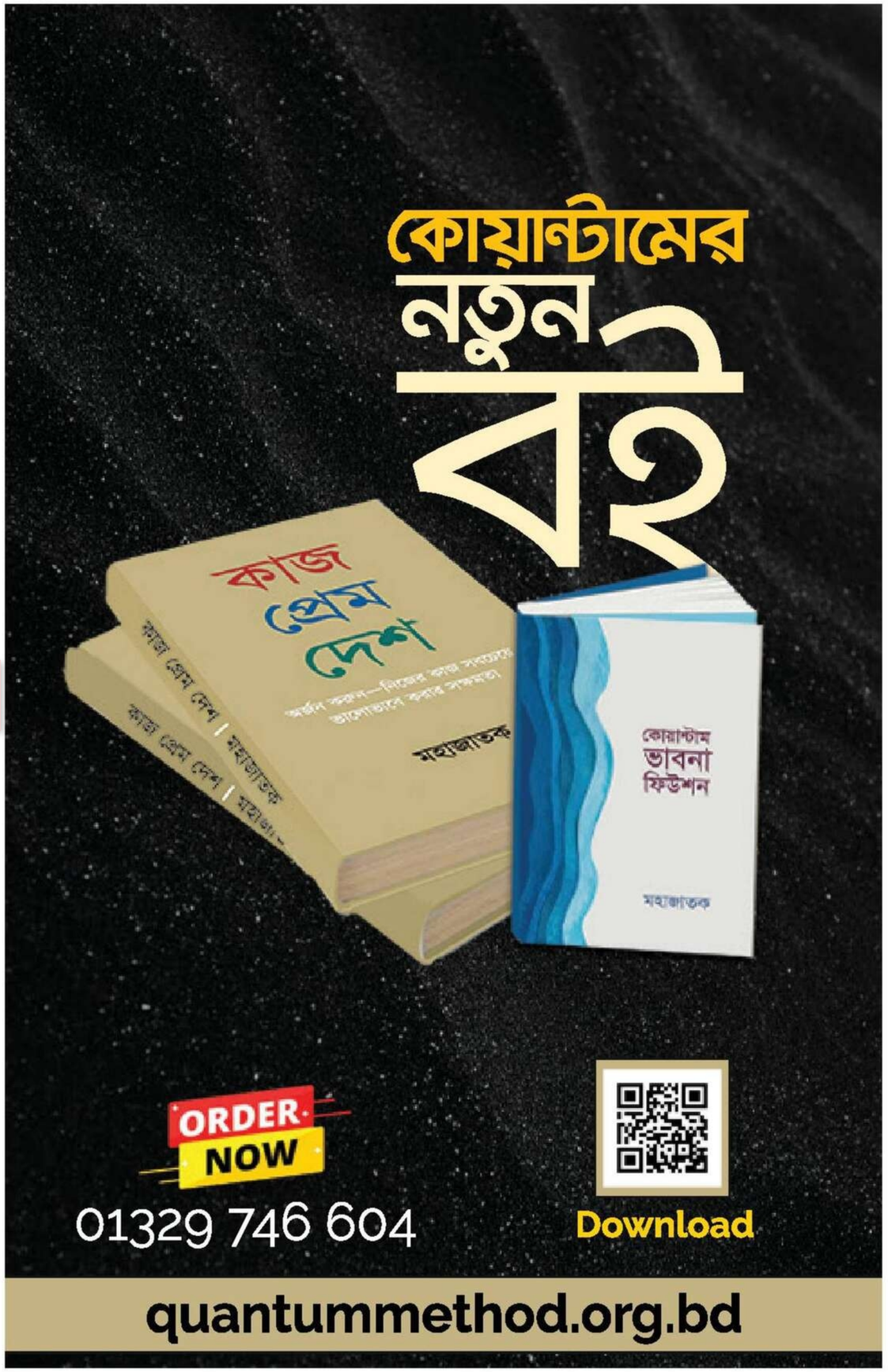

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

ফিচার

নিউক্লিয়ার বলের কাহন : পর্ব ৫
আরশাদ মোমেন ৪০

স্ট্রিং থিওরির গোড়ার কথা
আবদুল গাফফার ৪২

প্ল্যাঙ্ক স্কেলের রহস্য : যেখানে ভেঙে পড়ে সবকিছু
উচ্ছ্বাস তৌসিফ ৪৬

কোয়ান্টামের গোলকধাঁধা
আবুল বাসার ৫০

রাসায়নিক বিক্রিয়া সহজ পাঠ : পর্ব ৩
রউফুল আলম ৫৯

সুপারবাগের কবলে বিশ্ব, উপায় কী
শতাব্দী রায় ৬২

ধন্যবাদ চ্যাটজিপিটি, লাভ-ক্ষতির খতিয়ান
উচ্ছ্বাস তৌসিফ ৬৬

গেম অব থ্রোনসের ড্রায়ার উলফ কি ফিরল
কাজী আকাশ ৭২

বনের পাখির খাদ্য ও পুষ্টি
কাজী আলিম-উজ-জামান ৭৪

বিজ্ঞান কমিক
৩২, ৩৪

সাক্ষাৎকার

মানুষ যা ভাবতে পারে, তা করতেও পারে
—সুনিতা উইলিয়ামস নভোচারী, নাসা ৩৭

রকমারি বিজ্ঞান

দেরিতে ঘুম, মস্তিষ্কের অপূরণীয় ক্ষতি ৬৪
ব্লুটুথ যেভাবে কাজ করে ৬৮
মজার হবি ইলেকট্রনিকস ৭০

বিজ্ঞান ছড়া

প্যাকেট ভরা বাতাস
রোমেন রায়হান ১২

নিয়মিত বিভাগ

ডাকবাক্স ৮
ছবিঘর ১৩
গণিতের সমস্যা ৪৪
বিজ্ঞানায়োজন ৪৫
বইপত্র ৪৯
শব্দজট ৫২
আইনস্টাইনের ধাঁধা ৫৩
দুই চালে মাত ৬১
বুদ্ধির ব্যায়াম ৬৫, ৭৬
কার্যকারণ ৭৬
প্রশ্নোত্তরে বিজ্ঞান ৭৭
সুডোকু ৭৭
গণিতের কুইজ ৭৮
কুইজ ৭৯

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

প্রথমা প্রকাশিত বিজ্ঞান ও গণিতের নতুন বই

● প্রদীপ দেব
জামাল স্যারের মহাবিশ্ব ৳ ৩৮০
● আবুল বাসার
আবিষ্কারের কাহিনি ৳ ৪০০
● ওয়াল্টার লুইন। ভাষান্তর : আবুল বাসার
ফর দ্য লাভ অব ফিজিকস ২য় মুদ্রণ ৳ ৬০০
● পল ডেভিস। ভাষান্তর : আবুল বাসার
হাউ টু বিল্ড আ টাইম মেশিন ৳ ৩০০
● আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ
জিরো : দ্য বায়োগ্রাফি অব আ ডেঞ্জারাস আইডিয়া ৳ ৪২৫
● ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী
এক্সোপ্ল্যানেট : বহিঃসৌরগ্রহের খোঁজে ৳ ৪২০
● নাফিস তিহাম : সংকলন ও পরিমার্জন
বাংলাদেশে গণিত অলিম্পিয়াডের যত প্রশ্ন ২য় মুদ্রণ ৳ ৬০০
● রিচার্ড ফাইনম্যান। অনুবাদ : উচ্ছ্বাস তৌসিফ
দ্য ক্যারেক্টার অব ফিজিক্যাল ল ৳ ৪৫০
● কাজী আকাশ
ঝটপট গণিত ৳ ৩০০

প্রথমা প্রকাশিত আরও বই

● আব্দুল কাইয়ুম
আরও গণিত আরও স্মার্ট ৩য় মুদ্রণ ৳ ৩৪০
গণিত আর গণিত ৩য় মুদ্রণ ৳ ৩২০
গণিতের জাদু ১৩তম মুদ্রণ ৳ ৩২০
গণিতের ধাঁধা ৫ম মুদ্রণ ৳ ৩০০
বিজ্ঞানের রাজ্যে কেন কেন এবং কেন ২য় মুদ্রণ ৳ ৩৮০
প্রশ্নোত্তরে বিজ্ঞানের কী ও কেন ২য় মুদ্রণ ৳ ৩৫০
মজার গণিত ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ৳ ২৯০
সরস গণিত ৩য় মুদ্রণ ৳ ৩০০
● মুনির হাসান
প্রাথমিক গণিতের ভিত্তি ৯ম মুদ্রণ ৳ ৪২০
● কাজী আকাশ
গণিতের খেলা গণিতের মজা ২য় মুদ্রণ ৳ ২৫০
● ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী
অঙ্ক ও মেজোকাকুর হেঁয়ালি ৳ ৩৫০
● নাফিস তিহাম
গণিত অলিম্পিয়াড ১০১ সমস্যা ও সমাধান ৮ম মুদ্রণ ৳ ২৮০
● দীপেন ভট্টাচার্য
আকাশ পর্যবেক্ষকের নোটবই ৩য় মুদ্রণ ৳ ৩০০
● শিশিরকুমার ভট্টাচার্য
আইনস্টাইনের জীবন ও আপেক্ষিক তত্ত্ব ৩য় মুদ্রণ ৳ ৪০০
● আবুল বাসার অনূদিত বই
নীল ডিগ্রাস টাইসন ও গ্রেগরি মোন
অ্যাস্ট্রোফিজিকস সহজ পাঠ ৭ম মুদ্রণ ৳ ৩৫০
স্টিফেন হকিং ও লিওনার্ড ম্লোডিনো
দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন ২য় মুদ্রণ ৳ ৪০০
মিচিও কাকু
দ্য গড ইকুয়েশন থিওরি অব এভরিথিংয়ের খোঁজে ৪র্থ মুদ্রণ ৳ ৩৮০
প্যারালাল ওয়ার্ল্ডস ৭ম মুদ্রণ ৳ ৭৫০
ফিজিকস অব দ্য ইমপসিবল ৭ম মুদ্রণ ৳ ৭০০
● উচ্ছ্বাস তৌসিফ অনূদিত বই
পিটার অ্যাটকিনস
রসায়ন সহজ পাঠ ৩য় মুদ্রণ ৳ ৩০০
রিচার্ড ফাইনম্যান
সিক্স ইজি পিসেস ৪র্থ মুদ্রণ ৳ ৪০০
ফ্র্যাঙ্ক ক্লোজ
অ্যান্টিম্যাটার ৪র্থ মুদ্রণ ৳ ৩৫০
● পল ডেভিস
অনুবাদ : আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ
দ্য লাস্ট থ্রি মিনিটস ৩য় মুদ্রণ ৳ ৩০০

প্রথমা প্রকাশন
ঢাকা : ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা। ০১৯৫৫৫৫২১৭৭ ● ৪৩-৪৪ আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। ০১৯৫৫৫৫২১৭৬ ● শেফ'স টেবিল, ইউনাইটেড সিটি, ঢাকা। ০১৭৩০০০০৬০০ ● মান্নান মার্কেট, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭৩০০০০৬৪৮ ● সিলেট : ইউনিমার্ট বিল্ডিং, আম্বরখানা, সিলেট। ০১৭০৮৪৩৫৫৭৯
ঘরে বসে বই পেতে ভিজিট করুন www.prothoma.com ০১৭৩০০০০৬১৯

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

...এক শ!

অবশেষে তোমার শততম সংখ্যাটি পড়ে শেষ করলাম। সত্যি বলতে, অতুলনীয়। এক শটা মাস নাগাদ তুমি যে আমাদের মধ্যে বিজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে এত পরিশ্রম করছ, সে জন্য অ-অ-অনেক ধন্যবাদ। নুড়ি দিয়ে যেমন ভালোবাসা জানায় পেঙ্গুইন, তেমনি এই চিঠি তোমার প্রতি ভালোবাসা জানানোর আমার ছোট্ট প্রয়াস!

প্রিয়জনের যেকোনো গল্পই তো শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছে মধুর লাগে। আর সেই জায়গায় তুমি যখন আমার এত প্রিয়, তখন তোমার পথচলার কাহিনিটা কি উপভোগ্য না হয়ে পারে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আপুর লেখা 'বিশ্বাস' গল্পটিও কিন্তু অসাধারণ ছিল! আর শোনো, ১০০তম সংখ্যা বলে মেনে নিলাম, পরের সংখ্যা থেকে ছড়ায় জ্ঞান না থাকলে তা কিন্তু আর বরদাশত করা হবে না। আর একটা অনুরোধ করব, এটা তোমাকে না, শ্রদ্ধেয় আরশাদ মোমেন স্যারকে, 'স্যার, আপনি পত্রিকার ওপর দয়া করে রাগ করবেন না। আপনার মতো গুণীদের লেখাগুলোই তো আমাদের বিজ্ঞানচিন্তা পড়ার টনিক।'

আরেকটা কথা, তোমাকে একবার বলেছিলাম, দেশের বিষয় নিয়ে সংখ্যা ভালো লাগে। তারপর তুমি দেশের বিজ্ঞানীদের নিয়ে আরেকটা অসাধারণ সংখ্যা করেছ। সে জন্য গ্রহণ করো 'এত দিন না দিয়ে মনের বাক্সে জমা করা' এক বাক্স ধন্যবাদ।

আজ শেষ করা যাক তাহলে, কী বলো? তুমি জীববিজ্ঞান নিয়ে তেমন একটা লেখা দাও না, সে জন্য মাঝেমধ্যে রাগ হয়। তবে জেনে রাখো, ভালোবাসি এর চেয়েও ঢের বেশি। আর পরবর্তী সংখ্যায় ধাঁধার উত্তরগুলো ছাপতে ভুলো না যেন! বিদায়!

নাজমুল হাসান রাফসান, নবম শ্রেণি, বিজ্ঞান শাখা, আব্দুল আজিজ উচ্চবিদ্যালয়, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ

এ অনুভূতি পরিমাপযোগ্য নয়

১০০ সংখ্যাটা বেশ মোহনীয়, তাই না? আমাদের যাপিত জীবনে পরিপূর্ণতার এক মূর্ত প্রতীক। হোক শতাংশের পূর্ণমান বা পরীক্ষার খাতার পূর্ণ নম্বর—সবকিছুতে ১০০-এর জয়জয়কার। সেই ২০১৬ সাল থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে একটু একটু করে এগিয়ে গেছ—দীর্ঘ আট বছর! আর, আজ তুমি 'এপ্রিল ২০২৫' সংখ্যার হাত ধরে ১০০তম সংখ্যার বিজয়মুকুট পরে উজ্জ্বল মুখে হাসছ—শুধু তুমি নও, আমার মতো সব বিজ্ঞানচিন্তা পাঠকেরা গর্বে বুক ফুলিয়ে, অপার আনন্দে কাঁদছি। এই অসামান্য, অসাধারণ অনুভূতি যেন ∞ দিয়েও পরিমাপযোগ্য নয়!

সংখ্যাটা হাতে পাওয়ার পর শুধু অনিমেষ নয়নে প্রচ্ছদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কী চমৎকার ভিন্টেজধর্মী আর্টিস্টিক প্রচ্ছদ! এরপর পাতা উল্টে উল্টে দেখি তোমার ১০০ নিয়ে জমজমাট আয়োজন। বিজ্ঞানের বহুমুখী রঙে রাঙানো সেই ১০০ ছোট ছোট মজার তথ্য (ফ্যাক্ট) পড়ে দারুণ মজা পেয়েছি (যদিও অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে একটু রিপিটেশন হয়েছে, তবু তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখলাম। এর পর থেকে এসব বিষয়ে আরেকটু যত্নবান হবে, কেমন?)। সেই সঙ্গে আব্দুল কাইয়ুম স্যারের সাক্ষাৎকার, মলাট কাহিনি, কমিক-ফিচার, কুইজ, বিজ্ঞান ছড়া, রম্যরচনাসহ নিয়মিত-অনিয়মিত নানা পসারে যেন আলো হয়ে আছে সেই সংখ্যা। অন্য রকম টুইস্ট হিসেবে ছিল পাঠকদের গল্প-ফিচার, পড়ে আমি খুবই আনন্দিত! আশা করছি, এভাবে বিজ্ঞানচিন্তা পাঠকদের আরও সম্পৃক্ত রাখার উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে।

হঠাৎই আমার অন্যতম পছন্দের বুক-রিলেটেড প্ল্যাটফর্ম গুডরিডসে তোমার সন্ধান পেয়ে যাই (অন্যান্য সংখ্যার পাশাপাশি এই সংখ্যাটাও ছিল)। বলতে গেলে আমার বিস্ময়ে প্রায় বাক্‌রুদ্ধ হওয়ার মতো অবস্থা! এই ভেবেই আমি সবচেয়ে খুশি হই যে প্রতি মাসে তোমাকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি গুডরিডসেও তোমার আপডেট রাখতে পারব। বিষয়টা দারুণ না?

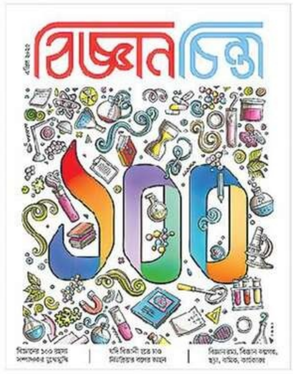

বরাবরের মতো তোমার নতুন সংখ্যার অপেক্ষায় থাকলাম। ভালো থেকো। বিজ্ঞানচিন্তার জয় হোক।

তূর্ণা দাশ, অষ্টম শ্রেণি, পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, পাবনা

কাঁঠাল নিয়ে সংখ্যা চাই

তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা নিয়ে আমার একটা কেচ্ছা আছে। সেটা বলছি।

মে মাসের ভরদুপুর। গরমে শরীর জ্বলে যাওয়ার উপক্রম। শরীর ঠান্ডা করতে আমি খাচ্ছিলাম ম্যাঙ্গো কাস্টার্ড। এমন সময় বাবা ঘরে ঢুকলেন, হাতে ম্যাগাজিন-টাইপ কিছু একটা। আবার হাবভাবও অন্য রকম। আমি কাস্টার্ড ফেলেই দৌড় দিলাম। প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে নিলাম জিনিসটা। বাবা তখন হাসছেন। জিনিসটা উল্টেপাল্টে দেখে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কাঁচা আমের বিশ্রী ছবি। একরাশ রাগ চাপা দিয়ে আবার খেতে বসলাম।

বিকেলে দেখলাম কোনো কাজ নেই করার মতো, তাই ম্যাগাজিনটা হাতে নিলাম। এবার চোখে পড়ল লেখাটা। বিজ্ঞানচিন্তা, মে ২০২২। আমের মাঝে এমন কী বিজ্ঞান থাকতে পারে, তা জানার জন্য ধৈর্য ধরে সবটা পড়লাম। আমি এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে ম্যাগাজিনটা দুইবার পড়ে ফেললাম। আর সবচেয়ে মজার ছিল আমের নামগুলো, যা পড়ে সারা দিন পাগলের মতো হেসেছি। যাহোক, এবার কাঁঠাল নিয়ে একটা কিছু করো। না হলে সে মন খারাপ করবে।

রামিশা তাবাসসুম ফরিহা, নবম শ্রেণি, নান্দাইল পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

প্রিয় রেজাউল করিম স্যারকে ধন্যবাদ

বিজ্ঞানচিন্তার প্রতিটি সংখ্যাই আমার কাছে অভাবনীয় মনে হয়। যত পড়ছি, তত জানছি। বিজ্ঞানচিন্তা আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন থেকে কুসংস্কার দূর করছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে বিজ্ঞানের আলো। একমাত্র বিজ্ঞানচিন্তার জন্য আমরা উপলব্ধি করতে পারছি বিজ্ঞান কোনো কারণের সমষ্টি নয়, বিজ্ঞান মানে আনন্দ ও রোমাঞ্চ। বাংলাদেশে বিজ্ঞানচিন্তার মতো মাসিক ম্যাগাজিন আমাদের তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক করার এক অভিনব উদ্যোগ। বিজ্ঞানচিন্তার এত সব উদ্যোগের জন্য বিজ্ঞানচিন্তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

পাশাপাশি ধন্যবাদ আমাদের প্রিয় রেজাউল করিম স্যারকে, যিনি আমাদের বিজ্ঞানচিন্তা পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যার ফলে ম্যাগাজিনটি আমাদের করে তুলছে বিজ্ঞানমনস্ক।

বিজ্ঞানচিন্তার মার্চ সংখ্যাটি অসাধারণ ছিল। বিজ্ঞানচিন্তার এমন অসাধারণ সংখ্যার জন্য ধন্যবাদ। এভাবেই সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রসারে রেখে যাও তোমার অমূল্য অবদান।

সাহিত্য পোদ্দার, দশম শ্রেণি, রাজবাড়ী সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, রাজবাড়ী

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

বিজ্ঞানচিন্তা ১০০

বরাবরের মতো গত মাসেও তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। এরপর যখন বিজ্ঞানচিন্তার প্রচ্ছদটা দেখলাম, তখন যেন এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভূত হলো। যাহোক, এক এক করে অবশেষে প্রকাশিত হলো বিজ্ঞানচিন্তার ১০০তম সংখ্যা। বিজ্ঞানচিন্তার জন্য শুভেচ্ছা রইল। বিজ্ঞানচিন্তা আরও অনেক বছর এগিয়ে যাক, এটাই আমার মতো পাঠকের চাওয়া।

গত সংখ্যায় দেখলাম, বিজ্ঞানের ১০০ রহস্য নিয়ে ছাপা হয়েছে একটি ফিচার। অনেক অজানা তথ্য জেনেছি তোমার কাছে। আসলে আমি বিজ্ঞানচিন্তার কাছে চেয়েছিলাম যেন সম্পাদকের একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। বিজ্ঞানচিন্তাকে আমি ঠিক আসলে বলিওনি, কিন্তু কীভাবে যেন সেটা বুঝে গেল। তাই তো ১০০তম সংখ্যায় সম্পাদকের একটা সাক্ষাৎকার ছেপে আমাকে অবাক করে দিল। আজ পর্যন্ত অনেক কিছু শিখেছি বিজ্ঞানচিন্তার কাছ থেকে। বিজ্ঞানচিন্তার কাছে আমি ঋণী। আসলে বিজ্ঞানচিন্তার ১০০তম সংখ্যাটা ছিল একদম সুপার। বিজ্ঞানচিন্তা, তুমি এগিয়ে যাও আরও অনেক দূর। ভালো থেকো।

মো. নানজিব ফাহিম, অষ্টম শ্রেণি, বর্ণমালা আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা

কল্পনায় চাঁদে ভ্রমণ

ছোটবেলা থেকেই আমার আকাশ ও মেঘ দেখতে খুব ভালো লাগে। রাতের বেলায় বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদের দিকে আনমনে চেয়ে থাকি। মনে মনে ভাবি, যদি চাঁদে যেতে পারতাম! চাঁদের কালো কালো দাগগুলো আমি নিজ চোখে দেখতে চাই। আমি মনে মনে চাঁদ নিয়ে নানা কল্পনা করি। রাতে জানালার ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের ঘোরে দেখি, চাঁদে চলে গেছি। শুনেছি, চাঁদে নাকি চাঁদের বুড়ি চরকা কাটে। এ নিয়ে আমার বিরাট কৌতূহল, সত্যিই কি চাঁদে কোনো বুড়ি থাকে? আপুকে জিজ্ঞাসা করলে আপু বলে, এটা নাকি নিছক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। হতে পারে শুধুই কল্পনা। কিন্তু কল্পনা করতে দোষ কোথায়?

তাহিরা ইবনাত তুবা, পঞ্চম শ্রেণি, নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়

বিজ্ঞান প্রজেক্ট নিয়ে সংখ্যা করো

বিজ্ঞান আসলেই মজার জিনিস। এই যে আমাদের চারপাশে নানা ঘটনা ঘটে, সবকিছুর পেছনে কিন্তু বিজ্ঞান কাজ করে। যখন কোনো ঘটনার পেছনে আমরা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা পাই, তখন আমাদের কাছে খুব আনন্দ লাগে। বিজ্ঞানচিন্তা তেমনই বিজ্ঞানের আনন্দ নিয়ে এসেছে আমার জীবনে। আমি বিজ্ঞানচিন্তা পড়া শুরু করি ২০১৮ সালে। প্রথম সংখ্যা থেকেই বিজ্ঞানচিন্তা পড়ে আমার অনেক ভালো লাগে। তার পর থেকে প্রতি মাসেই বিজ্ঞানচিন্তা পড়া শুরু করি। বিজ্ঞানচিন্তা পড়তে পড়তে মনে হয়, যেন হারিয়ে যাই বিজ্ঞানের রাজ্যে। এত সুন্দর করে গুছিয়ে প্রতিটি লেখা এবং তথ্যবহুল ম্যাগাজিন আমার কাছে এখন ভালোবাসার নাম। বিজ্ঞানচিন্তা পড়ার মাধ্যমে আমি বিজ্ঞানভীতি দূর করি। তাই বিজ্ঞানচিন্তাকে বলো বিজ্ঞান প্রজেক্ট নিয়ে একটি সংখ্যা বের করতে। আর এভাবে ছুঁয়ে যাক কোটি হৃদয়ে বিজ্ঞানচিন্তার বিজ্ঞানের আলো।

আল মামুন, একাদশ শ্রেণি, কালীপুর হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, চাঁদপুর

১০০তম সংখ্যার শুভেচ্ছা

তোমাকে যখন-ই পড়ি, শুধু অবাক হই। ভাবি, তুমি না থাকলে বিজ্ঞানের এই মজার তথ্যগুলো আমাকে কে দিত? কে পারত আমার এই বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে? এ জন্যই তো প্রতি মাসে তোমার অপেক্ষায় থাকি। ১০০তম সংখ্যার শুভেচ্ছা।

গাছেরা যদি কথা বলতে পারত!

আমি ভাবছিলাম, গাছেরা যদি কথা বলতে পারত বা ধরা যাক, কান্নার শব্দ থাকত, তাহলে কেমন হতো? যখন আমরা গাছে পেরেক ঠুকতাম, গাছগুলো হয়তো হাউমাউ করে চিৎকার করে বলত, 'ও মাগো! দয়া করো! আরেকটু ডানে ঠুকলে তো আমার কোমরটাই ভেঙে যেত!'

আর যখন গাছের পাতা ছিঁড়ে ফেলতাম, তখন পাতা কান্না করতে করতে বলত, 'আমার মায়ের হাত ছিঁড়ে দিলে...? আমাকে ছেড়ে দাও!'

তারপর বৃষ্টি হলে গাছগুলো খুশিতে ঝুমঝুমিয়ে গাইত, 'বৃষ্টি রে, আহা! কতই না শান্তি পেলাম, তুমি না এলে তো আমি কাঁচা শুঁটকি হয়ে যেতাম!'

আমি ভাবি, আমাদের বিজ্ঞানীরা যদি সত্যিই গাছের কথা শোনার জন্য কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেন, তখন আমরা ঠিকই জানতে পারব এরা কীভাবে আমাদের নিয়ে গোপনে হাসাহাসি করে। তারা হয়তো বলবে, 'এই মানুষগুলোও না! নিজেরা হাওয়া ছাড়া একমুহূর্তও বাঁচবে না, আর সেই হাওয়া তৈরি হওয়ার কারিগরদেরই কষ্ট দেয়।'

আচ্ছা, সত্যিই যদি গাছেরা কথা বলতে পারত, তাহলে কি আমরা গাছ কেটে ফেলতাম? নাকি গাছেরা আমাদের সঙ্গে চুক্তি করত যে 'আমরা তোমাদের হাওয়া দেব, কিন্তু বিনিময়ে তোমরা আমাদের লাল চা আর বিস্কুট খেতে দাও!'

ক্রমেই ভাবনাটা কৌতূহলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা যদি গাছের কণ্ঠস্বর আবিষ্কার করেই ফেলেন, তাহলে কি আমাদের পৃথিবীটা আগের মতো থাকবে...? নাকি গাছেরা তাদের নিজস্ব মিটিং বসিয়ে ঘোষণা করবে, 'মানুষ জাতি, তোমাদের সঙ্গে আমাদের জরুরি কথা আছে!'

সিদ্ধার্থ প্রামাণিক, অষ্টম শ্রেণি, নাটোর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, নাটোর

আর ১০০টা তথ্য তো ছিল অসাধারণ!

গৌতম চন্দ্র বর্মণ, দশম শ্রেণি, নান্দাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নান্দাইল, ময়মনসিংহ

পাশে থেকো, বিজ্ঞানচিন্তা

অন্যতম সেরা একটি মাসিক পত্রিকা বিজ্ঞানচিন্তা। এককথায় অসাধারণ। জ্ঞান-বিজ্ঞান কত সহজ ও সাবলীল ভাষায় লেখা হয় এতে, যা আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করে। বুঝতে সাহায্য করে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো। বিজ্ঞানচিন্তাকে ধন্যবাদ, এভাবে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য, আমাদের বিজ্ঞানের চলার পথ সহজ করার জন্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার জন্য। এভাবেই পাশে থেকো লাখো শিক্ষার্থীর।

সুপর্ণা পোদ্দার, টাউন মক্তব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজবাড়ী

আমাদের লিখুন

বিজ্ঞানচিন্তা
১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫
ওয়েবসাইট : www.bigganchinta.com
ই-মেইল : editor@bigganchinta.com
ফেসবুক : fb/Bigganchinta

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

বিজ্ঞানমনস্ক ছেলেবন্ধু

আহসান হাবীব

> মেয়েটি খুশিমনে সেই কাঙ্ক্ষিত ছেলের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল। সুদর্শন স্মার্ট ছেলেটার সঙ্গে পার্কে বসল সে। কেমন আছ

বিজ্ঞানমনস্ক এক মেয়ের খুব শখ, তার একটা ছেলেবন্ধু হবে। তার সঙ্গে সে সুন্দর সময় কাটাবে, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার নিয়ে কথা বলবে। তো একদিন মেয়েটির সেই সুযোগ এল। এই প্রথম সে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যাবে, যে ছেলেটি তার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়েছে। যাওয়ার আগে কী মনে করে তার বড় আপুর কাছে পরামর্শ চাইল মেয়েটি।

—আপু, তোমার সঙ্গে একটা বিষয়ে কথা বলতে পারি?

—পারিস।

—তোমাকে খুলেই বলি, আমি আসলে সঙ্গী হিসেবে একজন বিজ্ঞানমনস্ক ছেলেবন্ধু চাই। আজ একটা ছেলের সঙ্গে কথা হবে। কিন্তু আমি কী করে বুঝব ছেলেটি বিজ্ঞানমনস্ক?

—খুব সোজা, প্রথমে পাঁচজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম বলবি। যেমন ধর, গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন, স্টিফেন হকিং, তারপর ধর, মাদাম কুরি...

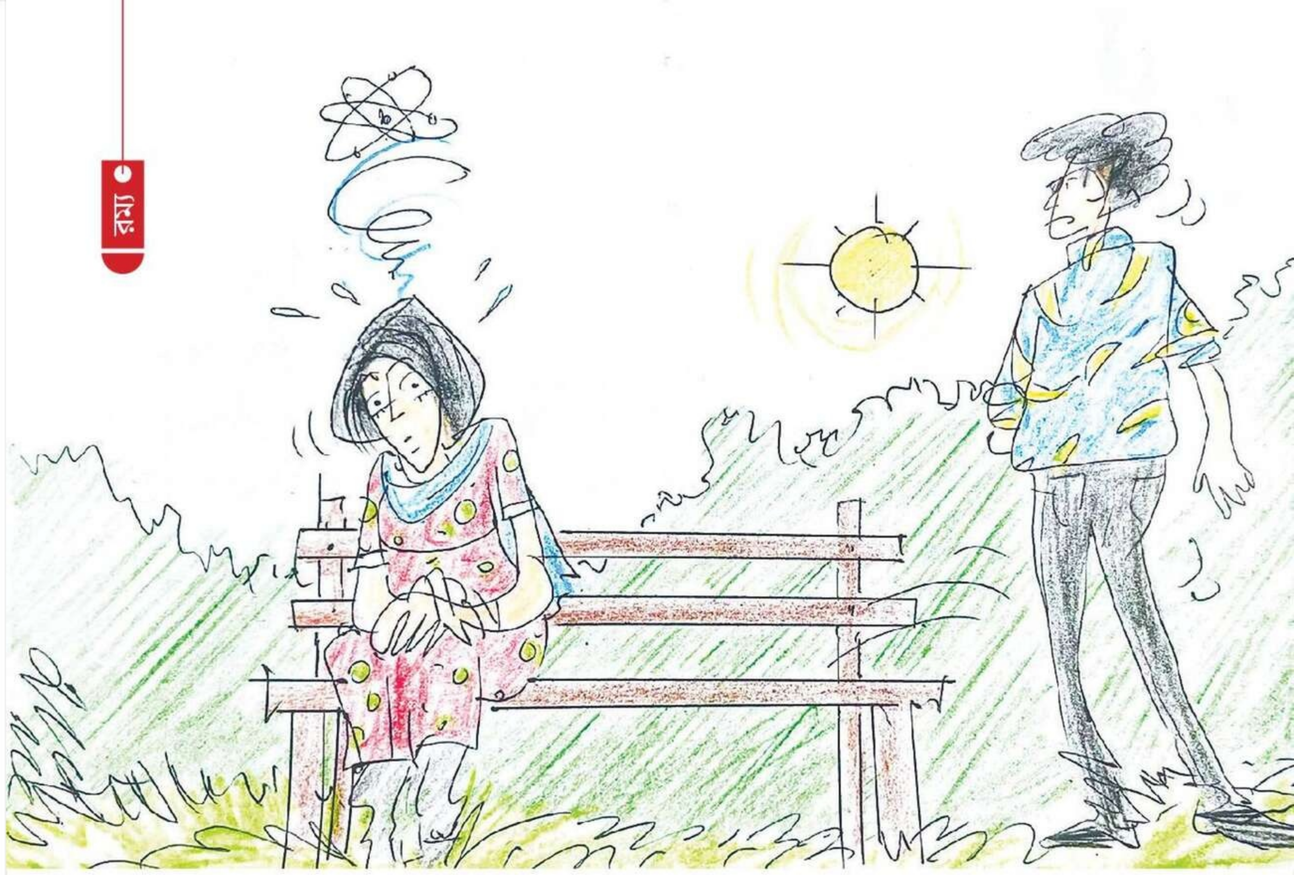

—আচ্ছা, তা না হয় বললাম, তারপর?

—এই পাঁচজনের মধ্যে অন্তত তিনজন বিজ্ঞানীকে সে যদি চিনতে পারে, তাহলে বুঝে নিবি সে বিজ্ঞানমনস্ক।

মেয়েটি খুশিমনে সেই কাঙ্ক্ষিত ছেলের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল। সুদর্শন স্মার্ট ছেলেটার সঙ্গে পার্কে বসল সে। কেমন আছ, ভালো আছি—এই সব কথাবার্তার পর মেয়েটি বলল :

—তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

—করো।

—আচ্ছা, তুমি কি গ্যালিলিওকে চেনো?

—না।

—নিউটনকে চেনো?

—না।

—আইনস্টাইনকে চেনো?

—না।

—স্টিফেন হকিংকে চেনো?

—না।

—মাদাম কুরি?

—না। আচ্ছা, তোমার সমস্যা কী? ছেলেটা যেন একটু খেপেই গেল। গলার স্বর উঁচু করে বলল, 'তখন থেকে তুমি শুধু একের পর এক তোমার বন্ধুদের নাম বলে চলেছ, আমি চিনি কি না; কেন, তুমি কি আমার বন্ধু সোহেলকে চেনো? রাব্বিকে চেনো? নাজমাকে চেনো? বদিউল আর যুথীকে চেনো?' হতভম্ব মেয়েটি দ্রুত দুই পাশে মাথা নাড়ল।

এবার যেন ছেলের গলা আরেক ডিগ্রি চড়ে গেল।

—তুমি যদি আমার বন্ধুদের না চেনো, আমার কী ঠেকা পড়েছে তোমার বন্ধুদের চেনার? বলে গটগট করে পার্ক থেকে হেঁটে বের হয়ে গেল। বোঝাই যাচ্ছে, এই মেয়ের সঙ্গে তার পোষাবে না।

লেখক : রম্য লেখক ও কার্টুনিস্ট; সম্পাদক, *উন্মাদ*

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

প্যাকেট ভরা বাতাস

রোমেন রায়হান

দোকান থেকে চিপস কিনেছ, সেটার প্যাকেট খুলে
কোম্পানিকে দিচ্ছ গালি বংশ-টংশ তুলে?
কোন কারণে খেপছ এত? মেজাজ কেন চড়া!
চিপস বেশি নাই! প্যাকেটখানা বাতাস দিয়েই ভরা?
ভাবছ বুঝি? চিপস কেনাতে খুব গিয়েছ ঠকে!
মেটাচ্ছ ঝাল, কমাচ্ছ রাগ কোম্পানিকে বকে?

চিপস চিবানো বন্ধ করে একটু দেখো ভেবে
এমনি কি কেউ চিপস প্যাকেটে বাতাস ভরে দেবে?
চিপসকে বাতাস আগলে রাখে কমায় ভাঙার ঝুঁকি
প্যাকেট ভরা বাতাস পেয়ে চিপসরা অনেক সুখী!
বাতাস ছাড়া প্যাকেটটাতে চিপস যদি হয় রাখা
সমস্ত চিপস ভেঙে গুঁড়ো, নষ্ট কেনার টাকা।

প্যাকেট ভরা বাতাস বলে কোম্পানি খায় খোঁটা
কেউ বলে নাই? অর্ডিনারি বাতাস তো নয় ওটা!
বাতাসটাতে আর কিছু নয়, নাইট্রোজেনই থাকে
চিপসকে তাজা, মুচমুচে এই নাইট্রোজেনই রাখে।
বাতাসটাতে অক্সিজেনের থাকলে উপস্থিতি
বাষ্প জমে সমস্ত চিপস নরম হওয়ার ভীতি!

চিপস বিষয়ে তোমার মতোই আমার অনেক মায়া
চিপস প্যাকেটে বাতাস দেখে রাগ কোরো না ভায়া!
বাতাস নিয়ে জ্ঞান যে দিলাম সেটার বিনিময়ে
তোমার কাছে দুয়েকটা চিপস চাইব কি নির্ভয়ে?

অলংকরণ : রাকিব

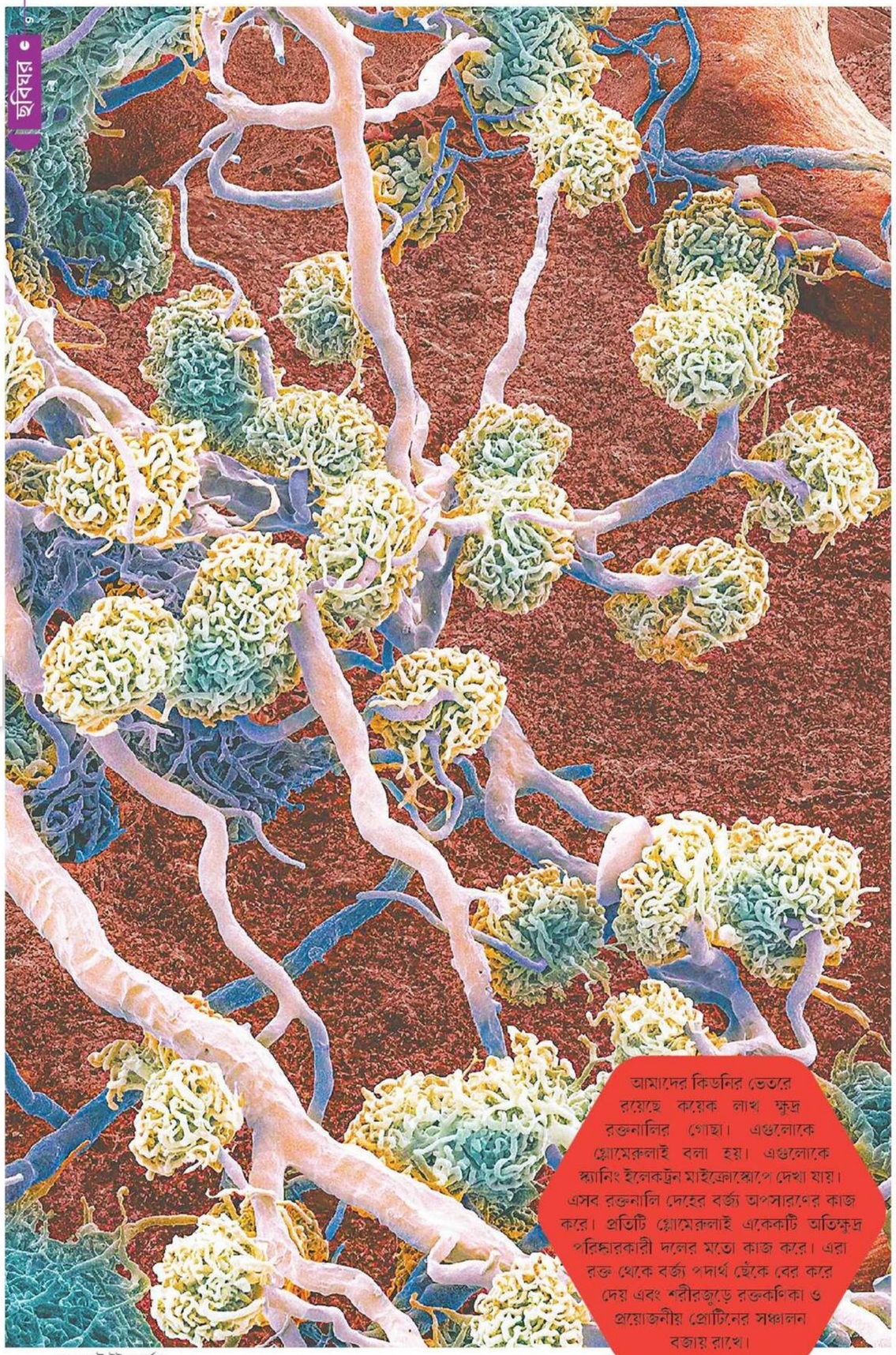

আমাদের কিডনির ভেতরে রয়েছে কয়েক লাখ ক্ষুদ্র রক্তনালির গোছা। এগুলোকে গ্লোমেরুলাই বলা হয়। এগুলোকে স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখা যায়। এসব রক্তনালি দেহের বর্জ্য অপসারণের কাজ করে। প্রতিটি গ্লোমেরুলাই একেকটি অতিক্ষুদ্র পরিষ্কারকারী দলের মতো কাজ করে। এরা রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ ছেঁকে বের করে দেয় এবং শরীরজুড়ে রক্তকণিকা ও প্রয়োজনীয় প্রোটিনের সঞ্চালন বজায় রাখে।

সূত্র : হাউ ইট ওয়ার্কস

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

মলাট কাহিনি

আমাদের মহাজাগতিক ঠিকানা

প্রদীপ দেব

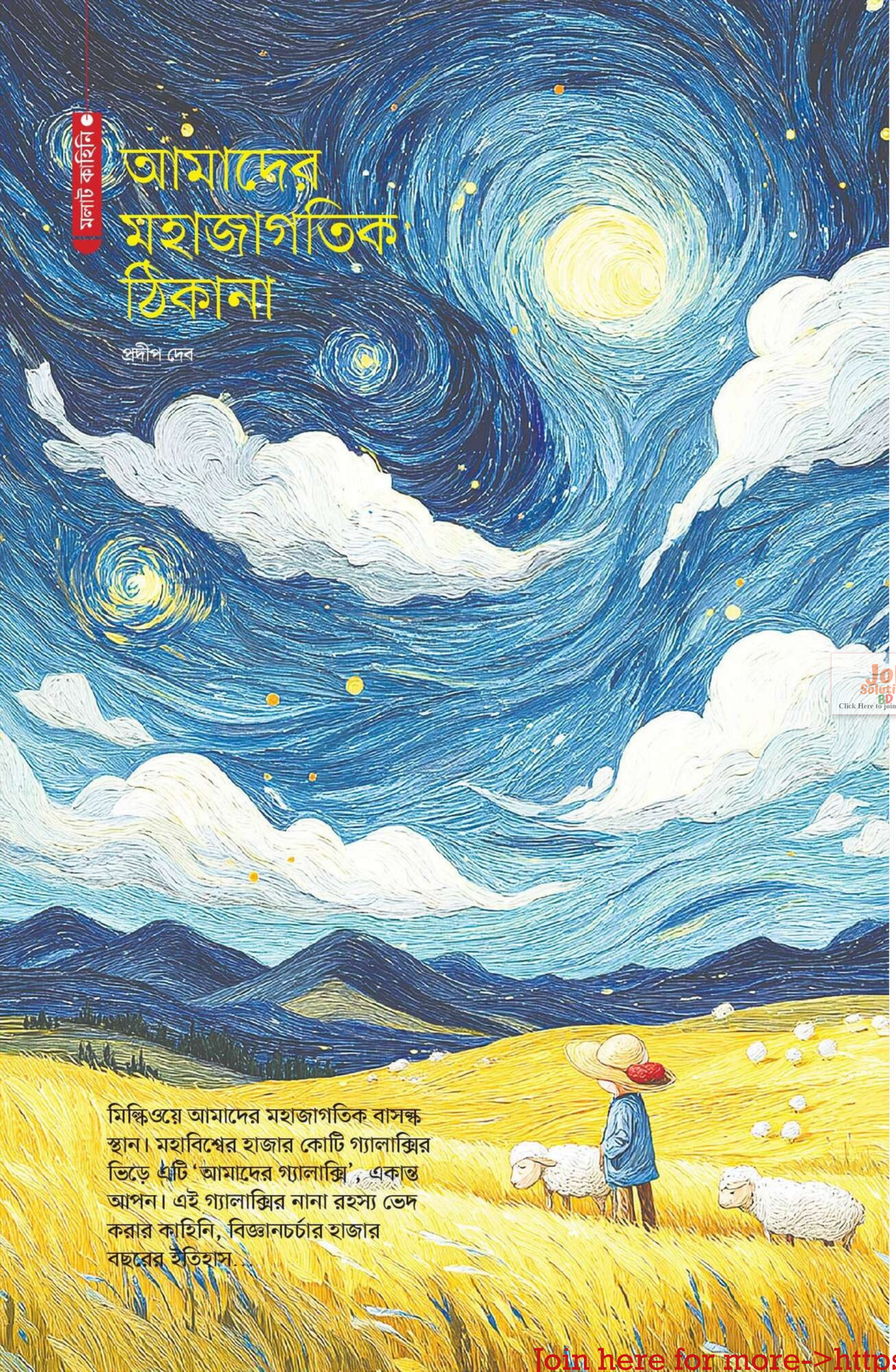

মিল্কিওয়ে আমাদের মহাজাগতিক বাসস্থান। মহাবিশ্বের হাজার কোটি গ্যালাক্সির ভিড়ে এটি 'আমাদের গ্যালাক্সি', একান্ত আপন। এই গ্যালাক্সির নানা রহস্য ভেদ করার কাহিনি, বিজ্ঞানচর্চার হাজার বছরের ইতিহাস...

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

পৃথিবীতে আমাদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো ঠিকানা আছে। আধুনিক স্যাটেলাইটের কল্যাণে জিপিএস আমাদের অবস্থান (লোকেশন) খুঁজে দেয় মুহূর্তেই। কিন্তু পৃথিবীর বাইরে, এই মহাবিশ্বে, আমাদের অবস্থান ঠিক কোথায়?

প্ল্যানেট আর্থ—পৃথিবী নামে এই গ্রহ আমাদের কাছে যত অনন্যই হোক না কেন—মহাবিশ্বে গ্রহের আনুমানিক সংখ্যা ১ হাজার কোটি কোটি কোটি ($১০^{২৪}$)। এদের প্রতিটিই তাদের নিজস্ব নক্ষত্রের চারপাশে ঘুরছে। পৃথিবী যেমন সৌরজগতের অংশ, সেরকম কোটি কোটি কোটি নক্ষত্রজগৎ আছে মহাবিশ্বে। এই নক্ষত্রগুলোর আবার আছে নিজস্ব ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি, যেখানে নক্ষত্রগুলো জোটবদ্ধ হয়ে থাকে। মহাবিশ্বে আনুমানিক দুই লাখ কোটি (দুই ট্রিলিয়ন) গ্যালাক্সি আছে। আমাদের সৌরজগৎ যে গ্যালাক্সিতে, তার নাম মিল্কিওয়ে। এই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে নক্ষত্রের সংখ্যা হতে পারে ১০ থেকে ৪০ হাজার কোটি। এত সব সূর্যের ভিড়ে আমাদের সৌরজগতের নাক্ষত্রিক ঠিকানা বিজ্ঞানীরা নির্ণয় করেছেন কয়েক শ বছরের নিরলস জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে।

আজ আমরা মহাবিশ্বের সাপেক্ষে আমাদের পৃথিবীর ঠিকানা বলতে পারি এভাবে: দৃশ্যমান মহাবিশ্বে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির সৌরজগতে আমরা থাকি। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি ছোট-বড় আরও ৫৪টি গ্যালাক্সি মিলে একটি গ্যালাক্সি-পাড়া বা লোকাল গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। এই পাড়ায় আমাদের গ্যালাক্সির সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সিটি হলো ক্যানিস মেজর ডোয়ার্ফ গ্যালাক্সি। এটি ছোট্ট একটি গ্যালাক্সি। ২৫ হাজার আলোকবর্ষ দূরের এই গ্যালাক্সিকে আমাদের গ্যালাক্সি ধীরে ধীরে গিলে খাচ্ছে (মহাকর্ষের টানে কাছে নিয়ে আসছে)।

আমাদের গ্যালাক্সি-পাড়ার সবচেয়ে বড় গ্যালাক্সির নাম অ্যান্ড্রোমিডা। এই অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি এত বিশাল এবং এত উজ্জ্বল যে আমাদের কাছ থেকে ২৫ লাখ আলোকবর্ষ দূরে হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী থেকে আমরা খালি চোখেই এই গ্যালাক্সির নক্ষত্রমণ্ডলী দেখতে পাই। তবে আমাদের জন্য এই গ্যালাক্সি এক দুঃসংবাদ। আগামী ৪০০-৫০০ কোটি বছরের মধ্যে অ্যান্ড্রোমিডা আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিকে গিলে খাবে, অর্থাৎ মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি মিশে যাবে অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির সঙ্গে। এটাকে অবশ্য আমাদের, অর্থাৎ পৃথিবীর বাসিন্দাদের জন্য সেই অর্থে বিপদ বলা যায় না। কারণ, এই দুটি গ্যালাক্সি মিশে গেলে আমরা হয়তো তা আলাদা করে টের পাব না। দুইয়ে মিলেমিশে তখন বিশাল সেই মহাগ্যালাক্সির নাম হবে মিল্কোমিডা।

কিন্তু এত সব আমরা জানলাম কীভাবে?

২.

যত দিন খালি চোখে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে, গ্যালাক্সি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের জানার পরিধি বিস্তার লাভ করেছে খুব ধীর প্রক্রিয়ায়। পৌরাণিক কাহিনি বিশ্বাস করে কেউ কেউ এই ছায়াপথকে দুধের নদী বললেও মানুষ ক্রমেই বুঝতে পেরেছে, এর সঙ্গে প্রাকৃতিক কোনো ঘটনার যোগ আছে। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল মত দিয়েছিলেন, এই ছায়াপথ হলো নক্ষত্র থেকে জ্বলন্ত বাষ্পের নিঃসরণ। এরপর প্রায় দেড় হাজার বছর পর্যন্ত এ রকম গ্রিক ধারণাই প্রচলিত ছিল।

নবম শতাব্দী থেকে এ ধারণার বদলে বাস্তবধর্মী বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রাধান্য পেতে শুরু করে। নবম শতাব্দীর আরব জ্যোতির্বিদ আবু আল-আব্বাস আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে খাতির আল-ফারগানি তাঁর *কিতাব ফি আল-হারাকাত আল-সামাইয়া ওয়া জাওয়ামি ইলম আল-নুজুম* (*এলিমেন্টস অব অ্যাস্ট্রোনমি*) বইয়ে পৃথিবীর ব্যাস, পৃথিবী থেকে সূর্য ও চাঁদের দূরত্ব পরিমাপের পাশাপাশি ছায়াপথ সম্পর্কেও কিছু নতুন ধারণা দেন। তিনি মিল্কিওয়েকে আকাশের একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে বর্ণনা করেন। গ্রিকদের কাল্পনিক ধারণার বদলে এটি ছিল অনেকটা বাস্তবের কাছাকাছি।

দশম শতাব্দীতে গ্যালাক্সি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণার আরও উন্নতি হয় মধ্যপ্রাচ্যের জ্যোতির্বিদদের হাত ধরে। ইরানের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবু আল-হুসাইন আবদুর রহমান ইবনে উমর আল-সুফি ৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে লেখা তাঁর *কিতাব আল-*

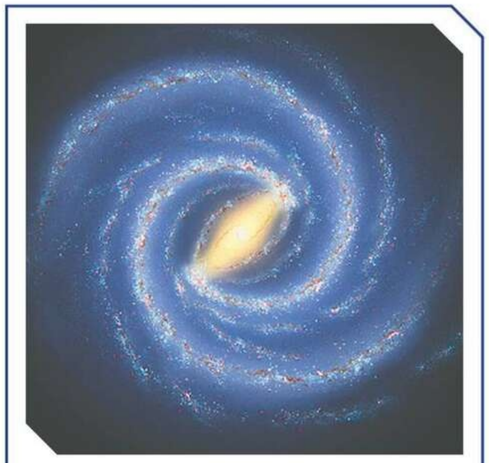

আমাদের আকাশগঙ্গা

ভারতীয় লোককাহিনিতে আমাদের ছায়াপথের নাম আকাশগঙ্গা। প্রাচীন মুনি-ঋষিরা ধারণা করে নিয়েছিলেন, আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যে নক্ষত্রমণ্ডলী দেখা যায়, তা আসলে স্বর্গে বয়ে চলা নাক্ষত্রিক নদী। গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলিয়ে এর নাম রাখা হয় আকাশগঙ্গা ছায়াপথ। এই আকাশগঙ্গার সঙ্গে মিল্কিওয়ে নামের সরাসরি কোনো শাব্দিক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না; বরং গ্রিক ও রোমান গল্পে সরাসরি 'মিল্কিওয়ে' শব্দটির উৎস পাওয়া যায়।

গ্রিক কাহিনিতে আছে, দেবতা জিউস আল্কমেনা নামে এক মানবীর প্রেমে পড়েন। জিউস ও আল্কমেনার একটি সন্তান হয়, যাঁর নাম হারকিউলিস। হারকিউলিসের মা যেহেতু দেবী নন, তাই হারকিউলিস জন্মসূত্রে অমরত্ব পাননি। জিউস জানেন, হারকিউলিসকে যদি কোনো দেবীর বুকের দুধ খাওয়ানো যায়, তাহলে হারকিউলিস অমরত্ব লাভ করবেন। দেবী হেরা ছিলেন জিউসের স্ত্রী। হারকিউলিস যেহেতু হেরার সন্তান নন, তাই হেরা স্বাভাবিকভাবে হারকিউলিসকে নিজের বুকের দুধ খাওয়াবেন না। সে জন্য জিউস একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। একদিন হেরা যখন ঘুমাচ্ছিলেন, জিউস ছোট্ট হারকিউলিসকে হেরার বুকে দিলেন। হঠাৎ ঘুম ভাঙার পর হেরা যখন দেখলেন শিশু হারকিউলিস তাঁর বুকের দুধ পান করছেন, দ্রুত তিনি হারকিউলিসকে বুক থেকে সরিয়ে দিলেন। এই সময় হেরার বুক থেকে দুধ ছড়িয়ে পড়ে আকাশে তৈরি হয় 'গ্যালাক্সিয়াস কাইক্লস', যার ইংরেজি অনুবাদ মিল্কি ওয়ে (Milky Way)। (উল্লেখ্য, বাংলায় শব্দ দুটি একসঙ্গে করে লেখা হয়—মিল্কিওয়ে। সরল বাংলায় মিল্কিওয়ের অর্থ হতে পারে দুধের নদী বা দুধসায়র।) রোমানদের গল্পও প্রায় একই রকম। এসব গল্প খ্রিষ্টের জন্মের অনেক বছর আগের। এরপর বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়ে গেলেও আমাদের গ্যালাক্সির নাম সেই প্রাচীন মিল্কিওয়েই রয়ে গেছে।

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

কাওয়াকিব আল-তাবিদ আল-মুসাওয়ার (*দ্য বুক অব ফিক্সড স্টারস*) বইয়ে ৪৮টি তারামণ্ডলের বর্ণনা দেন। মিল্কিওয়ে ছাড়াও আমাদের আকাশ থেকে আরও উজ্জ্বল যে অন্য ছায়াপথ, অর্থাৎ অ্যান্ড্রোমিডা দেখা যায়, তার প্রথম বৈজ্ঞানিক বর্ণনা রয়েছে এই বইয়ে। অ্যান্ড্রোমিডা নামটি দেওয়া হয়েছে গ্রিক পুরানের রাজকন্যা অ্যান্ড্রোমিডার নামানুসারে। সেই সময় অবশ্য মনে করা হতো, অ্যান্ড্রোমিডা মিল্কিওয়েরেই অংশ। বিজ্ঞানী আল-সুফিই প্রথম অ্যান্ড্রোমিডার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বর্ণনা করেন।

সেকালের আরেক বিজ্ঞানী আলী আল-হাসান ইবনে আল-হাসান ইবনে আল-হাইসাম। তিনি 'আলহাজেন' নামে পরিচিত এবং তাঁকে আধুনিক আলোকবিদ্যার জনকও মনে করা হয়। তিনি টলেমির পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। ১০১১-১২ সালে রচিত তাঁর বিখ্যাত *কিতাব আল-মানাজির*-এ (*দ্য বুক অব অপটিকস*) তিনিই প্রথম সম্ভাবনা প্রকাশ করেন যে মিল্কিওয়ে ছায়াপথ হতে পারে অসংখ্য নক্ষত্রের সমষ্টি, যা দূরত্বের কারণে একটি আলোকরেখার মতো দেখায়। টেলিস্কোপ আবিষ্কৃত হওয়ার ৫০০ বছরেরও আগে মিল্কিওয়ে সম্পর্কে তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন, পরে আমরা তা সত্য বলে প্রমাণিত হতে দেখেছি। দ্বাদশ শতাব্দীতে স্পেনের দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ আবু আল-ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদও মিল্কিওয়েকে অনেকগুলো নক্ষত্রের সমষ্টি বলে অনুমান করেছেন, যা পরবর্তী সময়ে আশ্চর্যজনকভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, গ্যালিলিওরও প্রায় ৫০ বছর আগে টেলিস্কোপ তৈরি ও ব্যবহার করেছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী লিওনার্ড ডিগেস, ১৫৫১ সালে

টেলিস্কোপ উদ্ভাবনের পর আকাশ পর্যবেক্ষণ নতুন মাত্রায় উন্নীত হলো। আমরা সবাই জানি, ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে গ্যালিলিও প্রথম আকাশের দিকে টেলিস্কোপ তাক করেন। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, গ্যালিলিওরও প্রায় ৫০ বছর আগে টেলিস্কোপ তৈরি ও ব্যবহার করেছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী লিওনার্ড ডিগেস, ১৫৫১ সালে।[২] তাঁর পুত্র টমাস ডিগেসও ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ১৫৫৯ সালে লিওনার্ড ডিগেসের মৃত্যু হলে টমাস তাঁর বাবার অসমাপ্ত গবেষণা চালিয়ে নেন। ১৫৭১ সালে তিনি বাবার লেখা একটি বই প্রকাশ করেন, যাতে টেলিস্কোপ তৈরি ও ব্যবহারের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এই বইয়ে মহাবিশ্বের অসীমতা এবং অসংখ্য নক্ষত্র গুচ্ছাকারে ছায়াপথ তৈরি করার সম্ভাবনার কথা রয়েছে। সে হিসেবে বলা চলে, মিল্কিওয়ে যে অসংখ্য নক্ষত্রের সম্মিলন, তা টেলিস্কোপের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে প্রকাশ করেছিলেন টমাস ডিগেস, গ্যালিলিওর অনেক বছর আগে।

১৬১০ সালে ইতালির পদার্থবিজ্ঞানী গ্যালিলিও তাঁর নিজের তৈরি টেলিস্কোপ তাক করলেন আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে যাওয়া মিল্কিওয়ের দিকে। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, খালি চোখে আবছা মেঘের মতো যা দেখা যায়, তাতে রয়েছে অসংখ্য নক্ষত্র। এত বেশি নক্ষত্র সেখানে যে তাঁর সীমিত শক্তির টেলিস্কোপের মাধ্যমে তাদের সংখ্যা গণনা করা ছিল অসম্ভব।[৩] তবে গ্যালিলিওর পর্যবেক্ষণ থেকে মিল্কিওয়ে সম্পর্কে প্রচলিত যে ধারণা ছিল, তা ভেঙে যায়। মিল্কিওয়ে যে অসংখ্য তারার সমষ্টি, সেই ধারণা বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করতে শুরু করেন।

কিন্তু মিল্কিওয়ের আকার, আয়তন, গতি ইত্যাদি নিরূপণের কাজ শুরু হয় আরও প্রায় দেড় শ বছর পর। ইংরেজ দার্শনিক টমাস রাইট ১৭৫০ সালে মিল্কিওয়ের নক্ষত্রগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তত্ত্বীয় ধারণা দেন তাঁর *অ্যান অরিজিনাল থিওরি অর নিউ হাইপোথিসিস অব দ্য ইউনিভার্স* বইয়ে। তিনি মনে করেন, মিল্কিওয়ের নক্ষত্রগুলো চাকতির মতো দুটি স্তরে সজ্জিত। সেখানে আমাদের সূর্যের অবস্থানও তিনি প্রায় সঠিকভাবে অনুমান করেন, যা চাকতির কেন্দ্র থেকে দূরে কিনারার একটি প্রান্তে রয়েছে।

গ্যালিলিওর পরে আরও অনেকে মিল্কিওয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন টেলিস্কোপের সাহায্যে। মিল্কিওয়ের কিনারায় ছোপ ছোপ মেঘের মতো উজ্জ্বল যে বস্তু দেখা যায়, তাকে গ্যালিলিও নেবুলা বা নক্ষত্র তৈরির কারখানা বলে ধারণা করেছিলেন। টমাস ধারণা করলেন, ওগুলো মিল্কিওয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন, হতে পারে অন্য কোনো নক্ষত্রমণ্ডলীর অংশ। সমসাময়িক সুইডিশ দার্শনিক এমানুয়েল সুইডেনবর্গ, জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট, সুইস-জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী জোহান হেনরিক ল্যামবার্ট প্রমুখ মিল্কিওয়ের নক্ষত্র সম্পর্কে টমাস রাইটের ধারণাকে সমর্থন দেন।[৪] কিন্তু এর সব কটি ছিল পর্যবেক্ষণভিত্তিক দার্শনিক অনুমান।

মিল্কিওয়ের নক্ষত্রগুলোর অবস্থান এবং উজ্জ্বলতার বৈজ্ঞানিক পরিমাপ শুরু করেন স্যার উইলিয়াম হার্শেল, ১৭৮০ সালে। জার্মান বংশোদ্ভূত এই ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী অনেকগুলো উন্নত মানের টেলিস্কোপ তৈরি করেন এবং

মাথার ওপরে ওই যে ধেয়ে যাচ্ছে দুধসাগর!
কৃতজ্ঞতা : স্পেস ডটকম/শন পার্কার, ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৩

সেগুলো দিয়ে নিয়মিত আকাশ পর্যবেক্ষণ করে ১৭৮১ সালে সৌরজগতের দূরবর্তী গ্রহ ইউরেনাস আবিষ্কার করেন। মিল্কিওয়ের বিভিন্ন দিক থেকে নক্ষত্রগুলোর অবস্থান নির্ণয় করে তিনি এ গ্যালাক্সির একটি মানচিত্র তৈরি করেন। ১৭৮৫ সালে *ফিলোসফিক্যাল ট্রানজেকশন*-এ প্রকাশিত (সংখ্যা ৭৫, পৃ. ২১৩-২৬৬) মিল্কিওয়ের মানচিত্র থেকে দেখা যায়, হার্শেল আমাদের সূর্যের অবস্থান নির্ণয় করেছেন মিল্কিওয়ের কেন্দ্রে। মিল্কিওয়ের দৈর্ঘ্য তিনি নির্ণয় করেছেন সেখানে অবস্থিত নক্ষত্রগুলোর গড় দূরত্বের ৮০০ গুণ, আর প্রস্থ হিসাব করেছেন নক্ষত্রগুলোর গড় দূরত্বের ১৫০ গুণ। হার্শেল ধরে নিয়েছিলেন, মিল্কিওয়ের প্রতি একক আয়তনে সমানসংখ্যক নক্ষত্র আছে। তাঁর হিসাব থেকে মিল্কিওয়ের সত্যিকারের আয়তন নির্ণয় করার কোনো উপায় ছিল না। কারণ, পৃথিবী থেকে কোনো নক্ষত্রেরই সঠিক দূরত্ব তখনো নির্ণয় করা যায়নি। মিল্কিওয়ের আকার-আকৃতির সঠিক পরিমাপের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।

১৮৪৭ সালে রুশ জ্যোতির্বিদ অটো স্ট্রুভ প্রমাণ করেন, মিল্কিওয়ের সব জায়গায় সমানসংখ্যক নক্ষত্র নেই। অর্থাৎ উইলিয়াম হার্শেল যে মিল্কিওয়ের নক্ষত্রের ঘনত্ব সমান বলে ধারণা করেছিলেন, তা সঠিক ছিল না। তাহলে হার্শেলের মিল্কিওয়ের মানচিত্রের আকৃতি ঠিক থাকলেও তার ভেতর আমাদের সূর্যের অবস্থান সঠিক নয়। তত দিনে পৃথিবী থেকে সূর্য ও সৌরজগতের অন্য কয়েকটি গ্রহের দূরত্ব নির্ণয় করা হয়ে গেছে। তার ভিত্তিতে অটো স্ট্রুভ মিল্কিওয়ের আকার নির্ণয় করলেন। তিনি দেখালেন, চ্যাপ্টা চাকতির মতো মিল্কিওয়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব কমপক্ষে ১৩ হাজার আলোকবর্ষ। অর্থাৎ মিল্কিওয়ের এক প্রান্তের একটি নক্ষত্রের আলো অন্য প্রান্তের নক্ষত্রে পৌঁছাতে ১৩ হাজার বছর সময় লাগবে। বর্তমানে আমরা জানি, মিল্কিওয়ের আকার এর চেয়ে আরও অনেক অনেক বড়। সে কথায় আমরা আসব একটু পর।

৩.

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই টেলিস্কোপের শক্তি ও ব্যাপ্তি—দুটোই পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণা। বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো অবজারভেটরি বা মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সময় মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির সঠিক আকার ও আয়তন সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে যাঁর হাত ধরে, তাঁর নাম হারলো শাপলি, মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরির উদীয়মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

শিল্পীর তুলিতে আল-সুফি, আল-ফারগানির ভাস্কর্য, শিল্পীর তুলিতে আলহাজেন, গ্যালিলিও গ্যালিলি, উইলিয়াম হার্শেল এবং হার্লো শ্যাপলির ফটোগ্রাফ (ওপর থেকে)

জ্যোতির্বিজ্ঞানী হওয়ার কোনো লক্ষ্যই ছিল না হারলো শাপলির। যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি রাজ্যের ছোট্ট একটি গ্রামে তাঁর জন্ম ১৮৮৫ সালে। ১৯১০ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন পিএইচডি করার জন্য।[৫] বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হেনরি নরিস রাসেলের তত্ত্বাবধানে গবেষণা শুরু করলেন শাপলি। ১৯১৪ সালে পিএইচডি শেষ করার পর পোস্টডক্টরেট ফেলো হিসেবে কাজ পেলেন ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরিতে। সেখানকার ১ দশমিক ৫২ মিটার ব্যাসের শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে তিনি দিনরাত নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে মিল্কিওয়ের সঠিক আকার নির্ণয় করেন। যদিও পরে প্রমাণিত হয়, শাপলির পরিমাপে কিছুটা ভুল ছিল; তবু সেই ১৯১৮ সালে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির এত বিস্তারিত পরিমাপ জ্যোতির্বিজ্ঞানে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছিলেন, আমাদের সূর্য মিল্কিওয়ের কেন্দ্র থেকে ৫০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। [পরে প্রমাণিত হয়েছে, সূর্য আসলে মিল্কিওয়ের কেন্দ্র থেকে ২৬ হাজার আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে।]

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির যে আকার শাপলি নির্ণয় করেছিলেন, তার আয়তন এত বেশি ছিল যে তিনিসহ আরও অনেক জ্যোতির্বিদ সেই সময় বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন, মিল্কিওয়েই মহাবিশ্বের একমাত্র গ্যালাক্সি। অর্থাৎ এটিই মহাবিশ্ব। কিন্তু অনেকের কাছে এটা অবিশ্বাস্য মনে হলো। ক্যালিফোর্নিয়ার লিক অবজারভেটরির জ্যোতির্বিজ্ঞানী হেবার কার্টিস ও তাঁর দল তাঁদের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দাবি করলেন, মিল্কিওয়ে মহাবিশ্বের একটি গ্যালাক্সি, একমাত্র গ্যালাক্সি নয়। মহাবিশ্ব আরও অনেক বড়, যেখানে মিল্কিওয়ের মতো আরও হাজার হাজার গ্যালাক্সি আছে।

এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস একটি বৈজ্ঞানিক বিতর্কের আয়োজন করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি 'দ্য গ্রেট ডিবেট' নামে খ্যাত। ১৯২০ সালের ২৬ এপ্রিল এই বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল মিউজিয়ামে। প্রচলিত তর্কবিতর্ক এটি ছিল না, ছিল মূলত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন। মিল্কিওয়েই পুরো মহাবিশ্ব—এ মতের পক্ষে হারলো শাপলি তাঁর তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তি উপস্থাপন করেন ৪০ মিনিট। এরপর হেবার কার্টিস উপস্থাপন করেন তাঁর তথ্য-উপাত্ত, যেখানে তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝান যে মিল্কিওয়ে ছাড়া আরও অনেক গ্যালাক্সি আছে মহাবিশ্বে। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। উপস্থিত বিজ্ঞানীদের ভোটে কার্টিসের যুক্তি জিতে যায়।

অবশ্য পরবর্তী চার বছরের মধ্যে এডউইন হাবল প্রমাণ করে দেন, অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ের অংশ নয়;

Job Solution BD Click Here to join the Channel
Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

আকাশজুড়ে আকাশগঙ্গা। কৃতজ্ঞতা : স্পেস ডটকম/অমিত অশোক কেম্বল, ৫ মে, ২০১৪

বরং মিল্কিওয়ে থেকে ২৫ লাখ আলোকবর্ষ দূরের আলাদা আরেকটি গ্যালাক্সি।

৪.

পৃথিবীর মানমন্দির থেকে টেলিস্কোপের সাহায্যে নক্ষত্রের আলো পর্যবেক্ষণ করে আলোর তীব্রতার সঙ্গে দূরত্বের বিপরীত বর্গের সূত্র প্রয়োগ করে নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় মহাজাগতিক ধূলিকণা, যা নক্ষত্রের আলোর তীব্রতা কমিয়ে দেয়। ধূলিকণার কারণে প্রায়ই হিসাবে গন্ডগোল হয়ে যায়। সেই গন্ডগোল মিটে গেল রেডিও টেলিস্কোপ উদ্ভাবনের পর থেকে। ধূলিকণা বেতার তরঙ্গের ওপর খুব বেশি প্রভাব খাটাতে পারে না। ফলে জ্যোতির্বিদ্যার পরিমাপ অনেক সহজ ও সঠিক হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠানোর পর থেকে মহাবিশ্বের অসংখ্য গ্যালাক্সির সন্ধান পাওয়া গেছে এবং আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ে সম্পর্কে আমরা এখন অনেক কিছু সঠিকভাবে জানি।

মিল্কিওয়ের আকার-আকৃতি

আমরা যেহেতু মিল্কিওয়ের ভেতরে থাকি, সেহেতু দূর থেকে মিল্কিওয়েকে পুরোপুরি দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি সম্ভব হতো, যদি আমরা ওপর থেকে মিল্কিওয়েকে দেখতে পেতাম, তাহলে এটিকে মনে হতো রাতের বেলা আলোঝলমলে এক শহরের মতো, যেখানে ২০ হাজার কোটি সূর্য আলো ছড়াচ্ছে। এই সূর্যগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আন্তনাক্ষত্রিক ধুলা ও গ্যাসের মেঘ, যেগুলো থেকে ভবিষ্যতে আরও নক্ষত্র তৈরি হবে। এক পাশ থেকে দেখলে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিকে একটি চ্যাপটা চাকতির মতো লাগবে, যার মাঝখানটা বেশ উঁচু। চাকতির চারপাশ ঘিরে রয়েছে বিশাল গ্যাসের গোলক। এর নাম গ্যালাকটিক হেলো।

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির চাকতির কেন্দ্রে ফুলে ওঠা জায়গার ব্যাস প্রায় তিন হাজার আলোকবর্ষ। এর ভেতরে আছে প্রায় এক হাজার নক্ষত্র, যাদের আনুমানিক ভর এক হাজার সূর্যের ভরের সমান। চাকতির সমতল অংশ থেকে কেন্দ্রের এই ঢিবির উচ্চতা প্রায় ১ হাজার ৮০০ আলোকবর্ষ। সমতল অংশে চাকতির পুরুত্ব প্রায় এক হাজার আলোকবর্ষ। কেন্দ্র থেকে চাকতির ব্যাসার্ধ প্রায় ৫০ হাজার আলোকবর্ষ। পুরো চাকতিকে ঘিরে অদৃশ্য হাইড্রোজেন গ্যাসের স্তর, কেন্দ্র থেকে যার ব্যাসার্ধ ৮০ হাজার আলোকবর্ষ।

পুরো চাকতি রয়েছে ৫০ হাজার আলোকবর্ষ ব্যাসার্ধের একটি গোলকের ভেতর। গোলকটির নাম স্টেলার হেলো। ধরে নেওয়া হয়, এই ৫০ হাজার আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত মিল্কিওয়ের মহাকর্ষ কাজ করে। এর বাইরে যদি কোনো নক্ষত্র পাওয়া যায়, তা অন্য কোনো গ্যালাক্সির বলে ধরে নেওয়া হয়।

হেলো

মিল্কিওয়ের হেলো অংশটি খুব রহস্যময়। এই গ্যাসীয় গোলকের ভেতর প্রায় ২০০ উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, যারা খুব কাছাকাছি থেকে গুচ্ছ তৈরি করেছে। এদের একেকটি গুচ্ছের ব্যাস মাত্র কয়েক শ আলোকবর্ষ। এই দূরত্বের ভেতরই লাখো নক্ষত্র গাদাগাদি করে খুব প্রতিসমভাবে একে অপরকে আকর্ষণ করে আছে। এই গ্লোবুলার ক্লাস্টার নিখুঁত গোলকাকার। এ জন্য বাংলায় এগুলোকে গোলকাকার নক্ষত্রপুঞ্জ বলা হয়। গ্যালাক্সির সবচেয়ে বয়স্ক নক্ষত্রগুলো থাকে এসব গুচ্ছে। চাকতির নক্ষত্রগুলোর বয়স যদি ১ হাজার কোটি বছর হয়, এ পুঞ্জের নক্ষত্রগুলোর বয়স ১ হাজার ৩০০ কোটি বছর।

চিত্র : উইলিয়াম হার্শেলের মিল্কিওয়ের ম্যাপ বা মানচিত্র (১৭৮৫)

> যদি আমরা ওপর থেকে মিল্কিওয়েকে দেখতে পেতাম, তাহলে এটিকে মনে হতো রাতের বেলা আলোঝলমলে এক শহরের মতো, যেখানে ২০ হাজার কোটি সূর্য আলো ছড়াচ্ছে

গ্যালাকটিক হেলোর গ্লোবুলার ক্লাস্টার উজ্জ্বল হলেও বাকি অংশ খুবই অন্ধকার। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, এই গোলকাকার নক্ষত্রপুঞ্জের সূর্যগুলোর ভর হেলোর মোট ভরের তুলনায় খুব সামান্য। তাহলে বাকি অন্ধকার স্থানে কি লুকিয়ে আছে ডার্ক ম্যাটার? এ রহস্যের সমাধান এখনো পাওয়া যায়নি।

চাকতি

এক পাশ থেকে দেখলে মিল্কিওয়েকে যেমন একটি সাদাসিধে চাকতির মতো লাগে, আসলে কিন্তু এটি সে রকম সোজা একটি চাকতি নয়। এর চারটি প্যাঁচানো বাহু আছে। কেন্দ্রের উঁচু ঢিবির কাছাকাছি দুটি প্রধান বাহু পারসিয়াস আর্ম ও স্যাজিটারিয়াস আর্ম। তৃতীয় বাহুর নাম সেনটোরাস আর্ম এবং চতুর্থ বাহু—আউটার আর্ম।

পারসিয়াস বাহু মিল্কিওয়ের বেশ প্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বাহু, যেখানে রয়েছে অনেকগুলো নীহারিকা বা নেবুলা, যেখানে নতুন নক্ষত্রের জন্ম হয়। এখানে নক্ষত্রের ঘনত্ব চাকতির নক্ষত্রের ঘনত্বের চেয়ে বেশি। এই বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ হাজার আলোকবর্ষ, কিন্তু সে তুলনায় প্রস্থ খুব কম, মাত্র ৩-৪ হাজার আলোকবর্ষ। এখানেই আছে ব্রিলিয়ান্ট স্টার ফাই ক্যাসিওপিয়া, যা আমাদের সূর্যের চেয়ে প্রায় ২ লাখ গুণ উজ্জ্বল। এই বাহুতেই আছে ক্র্যাব নেবুলা সুপারনোভা।

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

সংখ্যায় মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি

১০০ থেকে ৪০০
বিলিয়ন মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে নক্ষত্রের সংখ্যা।

২১০
কিমি/ সে. মিল্কিওয়ের চ্যাপটা অংশে নক্ষত্রের গতি।

৪১
লাখ সূর্যের ভর মিল্কিওয়ের কেন্দ্রের ব্ল্যাকহোলটির ভরের সমান।

১.৫
কোটি সূর্যের ভর মিল্কিওয়ের মোট ভরের সমান।

২৫
লাখ ডিগ্রি সেলসিয়াস! মিল্কিওয়ের হেলো অঞ্চলে গ্যাসের তাপমাত্রা।

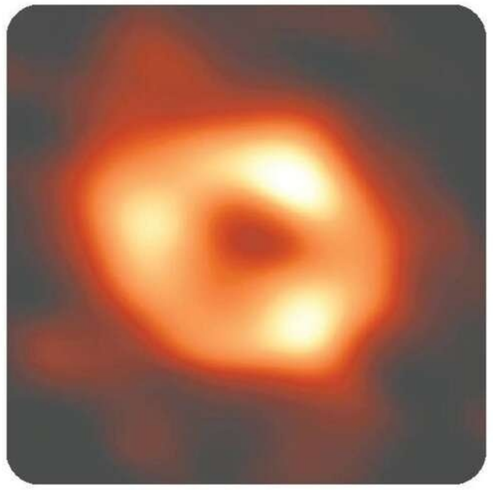

মিল্কিওয়েকেন্দ্রের ব্ল্যাকহোল স্যাজিটারিয়াস এ*-এর ছবি

মিল্কিওয়ের প্রধান বাহু স্যাজিটারিয়াস আর্ম। এর দৈর্ঘ্য ১০ থেকে ১৫ আলোকবর্ষ, প্রস্থ প্রায় ৩ থেকে ৪ আলোকবর্ষ। ইগল, ওমেগা, ট্রিফিড, ল্যাগুন নেবুলা রয়েছে এ বাহুতে। এখানে একাধিক ব্ল্যাকহোলের সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৬টি সূর্যের ভরের সমান ব্ল্যাকহোল সিগনাস এক্স-১ মিল্কিওয়ের এ বাহুতে রয়েছে।

পারসিয়াস ও স্যাজিটারিয়াস বাহুর মাঝখানে আরেকটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের বাহু আছে, যার নাম অরিয়ন বাহু বা অরিয়ন স্পার। এই অরিয়ন স্পারের আগার দিকে আমাদের সূর্যের বাড়ি। এই সৌরজগতের ছোট্ট গ্রহ পৃথিবীতে আমাদের বাস। এই বাহুতে আছে রিং নেবুলা, অরিয়ন নেবুলা, বাটারফ্লাই ক্লাস্টার, টলেমি ক্লাস্টার ইত্যাদি।

মিল্কিওয়ের কেন্দ্রে যে উঁচু ঢিবি আছে, সেটাই আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্র বা গ্যালাকটিক সেন্টার। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এটাই গ্যালাক্সি রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে কেন্দ্রের নক্ষত্রপুঞ্জ সম্পর্কে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৮৩ সালে ভেরি লার্জ রেডিও টেলিস্কোপের মাধ্যমে জানা গেছে, এর কেন্দ্রে ঘূর্ণমান গ্যাস চক্রাকারে ঘুরছে। ১৯৯৭ সালে মিল্কিওয়ের কেন্দ্রের কাছাকাছি নক্ষত্রগুলোর অস্বাভাবিক দ্রুত ঘূর্ণন বেগ পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন, মিল্কিওয়ের এই কেন্দ্রে আছে ২৫ লাখ সূর্যের ভরসম্পন্ন বিশাল ব্ল্যাকহোল স্যাজিটারিয়াস এ*। ২০২২ সালের ১২ মে ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপের মাধ্যমে এই ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরের ছবিও তোলা হয়েছে। আর কেন্দ্র থেকে মাত্র ১০ আলোকবর্ষ দূরে আছে উত্তপ্ত গ্যাসের মেঘ—স্যাজিটারিয়াস এ কমপ্লেক্স।

মিল্কিওয়ের কেন্দ্রের ১০০ আলোকবর্ষ ব্যাসের মধ্যে যে চৌম্বকক্ষেত্র পাওয়া গেছে, তার তীব্রতা মিল্কিওয়ের অন্যান্য জায়গার চৌম্বকক্ষেত্রের তীব্রতার চেয়ে প্রায় হাজার গুণ বেশি। এই চৌম্বকক্ষেত্রের সঠিক উৎস এখনো অজানা।

ভর ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি একটি স্পাইরাল গ্যালাক্সি। এর উজ্জ্বলতা ১ হাজার ৪০০ কোটি সূর্যের উজ্জ্বলতার সমান। ডার্ক ম্যাটারসহ এর মোট ভর ১ লাখ কোটি সূর্যের ভরের সমান, যার মধ্যে নক্ষত্রের ভর ২০ হাজার কোটি সূর্যের ভরের সমান, আর মোট গ্যাসের ভর : ২ হাজার কোটি সূর্যের ভর, ধূলিকণার ভর : ২০ কোটি সূর্যের ভরের সমান। গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারপাশে আমাদের সূর্যের একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে ২২ কোটি বছর।

৫.

মিল্কিওয়ে সম্পর্কে আমাদের এখনো অনেক বিষয় জানা বাকি। অতি সম্প্রতি (১১ মার্চ ২০২৫) মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা 'স্পেকট্রো-ফটোমিটার ফর দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ইউনিভার্স, ইপক অব রি-আয়নাইজেশন অ্যান্ড আইসেস এক্সপ্লোরার' (SPHEREx) মিশন চালু করেছে। এই স্যাটেলাইট ১১ মার্চ ২০২৫ মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। ১ মে এ স্যাটেলাইট কাজ শুরু করেছে। আগামী দুই বছর ধরে মহাকাশে মহাবিশ্বের ৪৫ কোটির বেশি গ্যালাক্সির তথ্য সংগ্রহ করবে স্যাটেলাইটটি। পাশাপাশি আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিরও ১০ কোটির বেশি নক্ষত্রের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে জানার চেষ্টা করবে, মহাবিশ্বের উদ্ভব হওয়ার আসল রহস্য কী। প্রাণের উদ্ভব ঘটার জন্য যেসব উপাদান দরকার, মিল্কিওয়ের অন্যান্য নক্ষত্রের জগতের অন্য কোনো গ্রহে তা পাওয়া যায় কি না, তা-ও অনুসন্ধান করে দেখবে এই মিশন।[৬] সেসব তথ্য থেকে মিল্কিওয়ের অজানা অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী।

লেখক : শিক্ষক ও গবেষক, আরএমআইটি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া

সূত্র : ১. জিম আল-খলিলি, *দ্য হাউস অব উইজডম : হাউ অ্যারাবিক সায়েন্স সেভড অ্যানশিয়েন্ট নলেজ অ্যান্ড গেভ আস দ্য রেনেসাঁ*, দ্য পেঙ্গুইন প্রেস, নিউইয়র্ক, ২০১১।
২. জন গ্রিবিন, *গ্যালাক্সি : আ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮।
৩. গাইলস স্পারো, *ফিফটি আইডিয়াস ইউ রিয়েলি নিড টু নো অ্যাস্ট্রোনমি*, কুয়েরকাস, লন্ডন, ২০১৬।
৪. ফ্রান্সোইস কমবিস ও জেমস লেকিস, 'দ্য মিল্কিওয়ে স্ট্রাকচার, ডায়নামিকস, ফরমেশন অ্যান্ড ইভল্যুশন', *কারেন্ট ন্যাচারাল সায়েন্সেস*, প্যারিস, ২০১৬।
৫. জে পি ম্যাকইভয়, *দ্য ইউনিভার্স ফ্রম অ্যানশিয়েন্ট ব্যাবিলন টু দ্য বিগ ব্যাং*, রবিনসন, লন্ডন, ২০১০।
৬. https://www.jpl.nasa.gov/missions/spherex

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি সম্পর্কে আরও জানতে ডান পাশের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন অথবা ভিজিট করুন : bigganchinta.com

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

মলাট কাহিনি

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি

আমাদের গ্যালাক্সিটির নাম মিল্কিওয়ে। মাঝারি আকৃতির স্পাইরাল বা প্যাঁচানো বাহুবিশিষ্ট গ্যালাক্সি এটি। বিশাল এ মহাবিশ্বে মিল্কিওয়ের মতো প্রায় দুই ট্রিলিয়ন গ্যালাক্সি আছে। গ্যালাক্সি মানে, মহাকর্ষের টানে অনেক নক্ষত্র, গ্যাস ও ধূলিকণার সমাহার। এককথায় বলা যায়, নক্ষত্রপুঞ্জ।

মিল্কিওয়ের গঠন

মিল্কিওয়ে একটা সাধারণ স্পাইরাল গ্যালাক্সি। এর কেন্দ্রে একটা স্ফীত অংশ তথা নিউক্লিয়াস আছে। আর একদম মাঝে রয়েছে একটা বিশালাকার ব্ল্যাকহোল। মিল্কিওয়ের দুটি বড় স্পাইরাল বা সর্পিলাকার প্যাঁচানো বাহু রয়েছে—স্কুটাম-সেন্টোরাস আর পার্সিয়াস বাহু। এগুলো কেন্দ্র থেকে দুই দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি আরও অনেক ছোট বাহুও আছে। এই বাহুগুলো মিলে গ্যালাক্সির একটা পাতলা চাকতির মতো তৈরি করেছে। এই চাকতি প্রায় ১ লাখ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার আলোকবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ ছাড়া গ্যালাক্সির চারপাশে রয়েছে অনেক নক্ষত্র। এসব নক্ষত্র মিলে ব্যাস প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার থেকে ২ লাখ আলোকবর্ষের মতো।

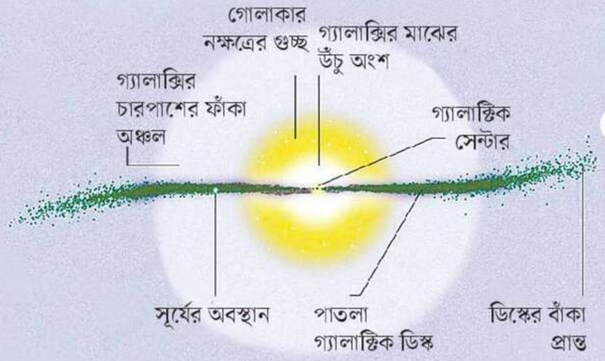

মিল্কিওয়ের পাশের দৃশ্য

সবুজ রঙে দেখানো সেফাইড ধরনের নক্ষত্র নিয়ে ঠিকঠাক মাপজোখ করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মিল্কিওয়ের কিনারাগুলো একটু বেঁকে গেছে। মনে করা হয়, অনেক আগে কোনো ছোট গ্যালাক্সির সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার ফলে এই বিকৃতি ঘটেছে।

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে কতগুলো নক্ষত্র আছে?

সঠিক সংখ্যা বলা কঠিন। কারণ, বেশির ভাগ নক্ষত্র খুব কম আলো দেয়। তবে বিজ্ঞানীদের ধারণা, মিল্কিওয়েতে প্রায় ১০০ থেকে ৪০০ বিলিয়ন নক্ষত্র রয়েছে।

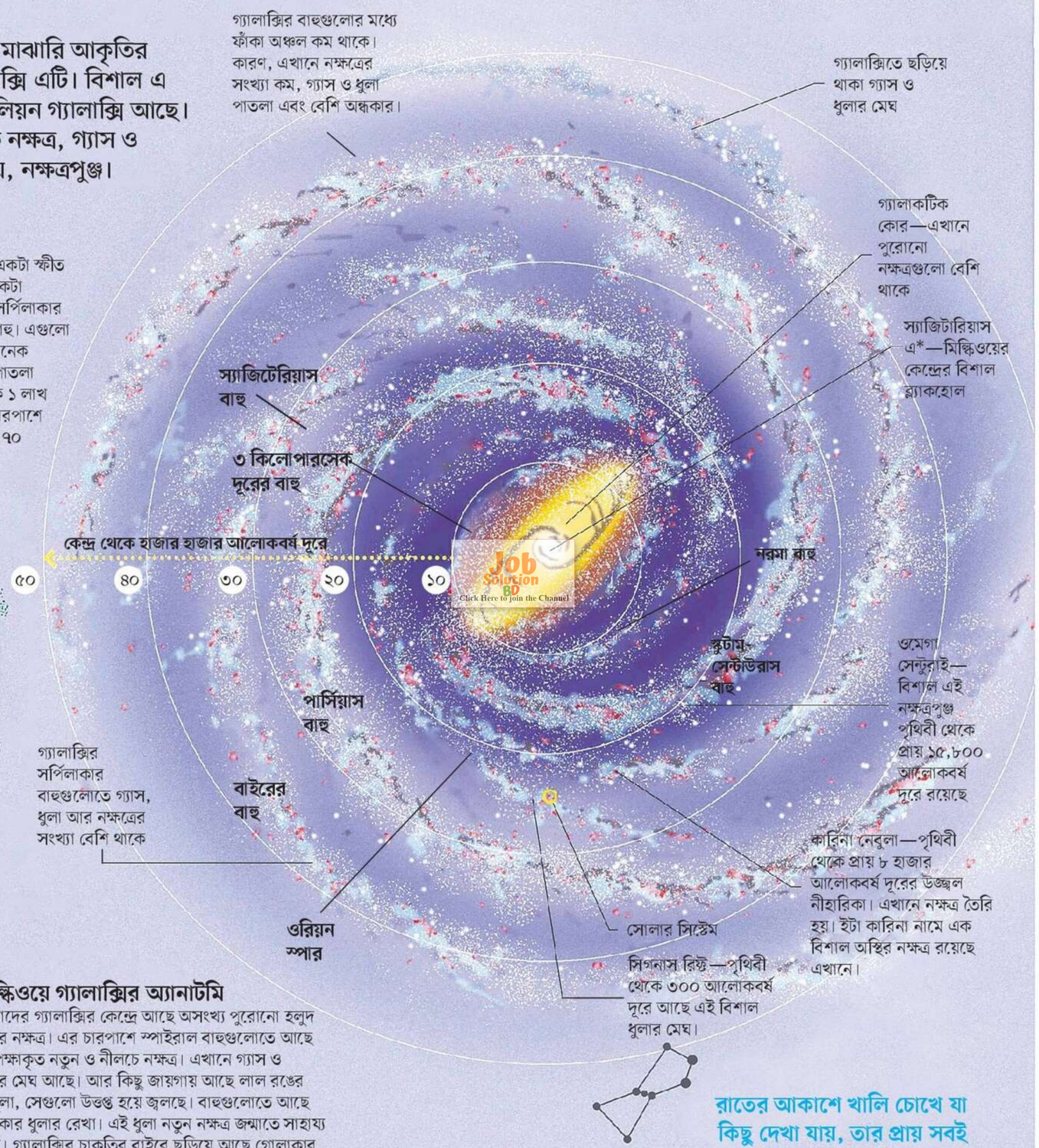

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির অ্যানাটমি

আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে আছে অসংখ্য পুরোনো হলুদ রঙের নক্ষত্র। এর চারপাশে স্পাইরাল বাহুগুলোতে আছে অপেক্ষাকৃত নতুন ও নীলচে নক্ষত্র। এখানে গ্যাস ও ধুলার মেঘ আছে। আর কিছু জায়গায় আছে লাল রঙের নেবুলা, সেগুলো উত্তপ্ত হয়ে জ্বলছে। বাহুগুলোতে আছে অন্ধকার ধুলার রেখা। এই ধুলা নতুন নক্ষত্র জন্মাতে সাহায্য করে। গ্যালাক্সির চাকতির বাইরে ছড়িয়ে আছে গোলাকার নক্ষত্রপুঞ্জ। এগুলো গ্যালাক্সিকে ঘিরে বড় কিন্তু ফাঁকা প্রভামণ্ডল তৈরি করেছে।

রাতের আকাশে খালি চোখে যা কিছু দেখা যায়, তার প্রায় সবই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির অংশ।

হাউ স্পেস ওয়ার্কস অবলম্বনে **লিটন রায়**

আমাদের স্থানীয় অঞ্চল

আমাদের সূর্য মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে প্রায় ২৬ হাজার আলোকবর্ষ দূরে ওরিয়ন বাহুর প্রান্তে অবস্থিত। এখানকার পরিবেশ অন্য রকম। আমরা একটা গরম, আয়নিত হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদ্‌বুদে বাস করছি। এই বুদ্‌বুদ ঠান্ডা ধুলা ও মলিকুলার হাইড্রোজেন গ্যাসের মেঘ দিয়ে ঘেরা। এই মেঘগুলোর মধ্যে নতুন নক্ষত্রের জন্ম হচ্ছে। আমাদের আশপাশে অনেকগুলো গ্যাসের বুদ্‌বুদ আছে। প্রতিটি বুদ্‌বুদের প্রান্ত উজ্জ্বল ধুলার লুপের মতো।

আমাদের কাছের বস্তুগুলো

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কাছাকাছি অঞ্চলের এই ম্যাপে ওরিয়ন বাহুর একটা অংশ দেখাচ্ছে। সূর্য ম্যাপের মাঝামাঝি আছে। এখানে হাইড্রোজেন গ্যাসের মেঘগুলো হলুদ রঙের, গ্যাস আর ধুলার মেঘ দেখানো হয়েছে লাল রঙের। আর নীল রং দিয়ে বোঝানো হয়েছে বিশাল নক্ষত্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ।

আকাশে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি

রাতের আকাশে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি দেখতে একটা উজ্জ্বল, সাদাটে-ধূসর ঝাপসা আলোর রেখার মতো মনে হয়। এই রেখা অসংখ্য নক্ষত্রে পূর্ণ। এর দিকে তাকালে আমরা গ্যালাক্সির ডিস্কের গভীরে দেখতে পাই।

উত্তর গোলার্ধ থেকে মিল্কিওয়ে

Job Solution BD Click Here to join the Channel
Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

মলাট কাহিনি

মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থান

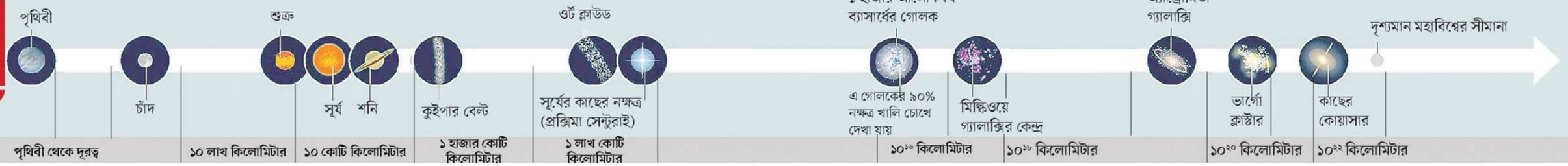

পৃথিবীর ব্যাস ১২ হাজার ৭৬০ কিলোমিটার। চাঁদ পৃথিবী থেকে ৩ লাখ ৮৪ হাজার ৪০০ কিলোমিটার দূরে।

পাথুরে অভ্যন্তরীণ গ্রহগুলো থাকে প্রধান গ্রহাণু বেল্টের ভেতরে। এগুলো পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের চেয়ে ২.৫ গুণ দূরে।

সৌরজগতের সব গ্রহ আমাদের স্থানীয় নক্ষত্র সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে

গ্রহগুলোর বাইরে আছে কুইপার বেল্ট, যা সূর্য থেকে প্রায় ১৫ বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে।

মহাবিশ্বে বয়স ১৩.৮ বিলিয়ন বছর

সৌরজগৎ মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির অংশ। এই গ্যালাক্সিতে প্রায় ১০০-৪০০ বিলিয়ন নক্ষত্র আছে।

পৃথিবী ও চাঁদ

সৌরজগতের ভেতরের অংশ

সৌরজগৎ

মিল্কিওয়ে

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ডিস্কের ব্যাস ১ লাখ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার আলোকবর্ষ।

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিও লোকাল গ্রুপের সদস্য

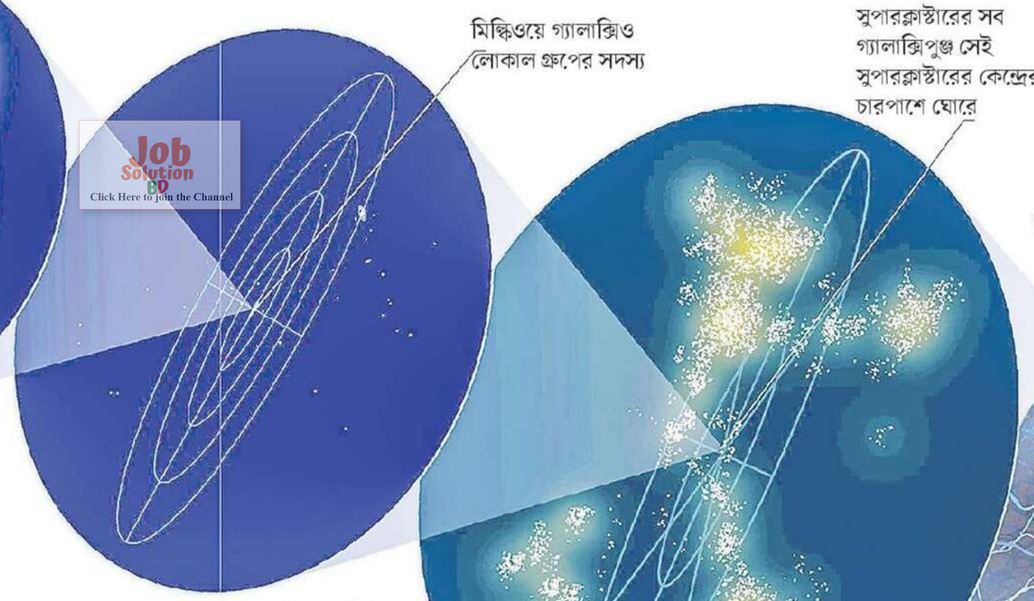

লোকাল গ্রুপ

লোকাল বা স্থানীয় গ্রুপ আরও কিছু গ্যালাক্সিপুঞ্জের সঙ্গে মিলে গঠন করেছে স্থানীয় লোকাল সুপারক্লাস্টার (লানিয়াকেয়া)

সুপারক্লাস্টারের সব গ্যালাক্সিপুঞ্জ সেই সুপারক্লাস্টারের কেন্দ্রের চারপাশে ঘোরে

লোকাল সুপারক্লাস্টার

সুপারক্লাস্টারগুলো অবস্থিত ফিলামেন্টের পাশে। এই ফিলামেন্টগুলো আবার ভয়েড নামে ফাঁকা স্থানগুলোতে তৈরি হয়।

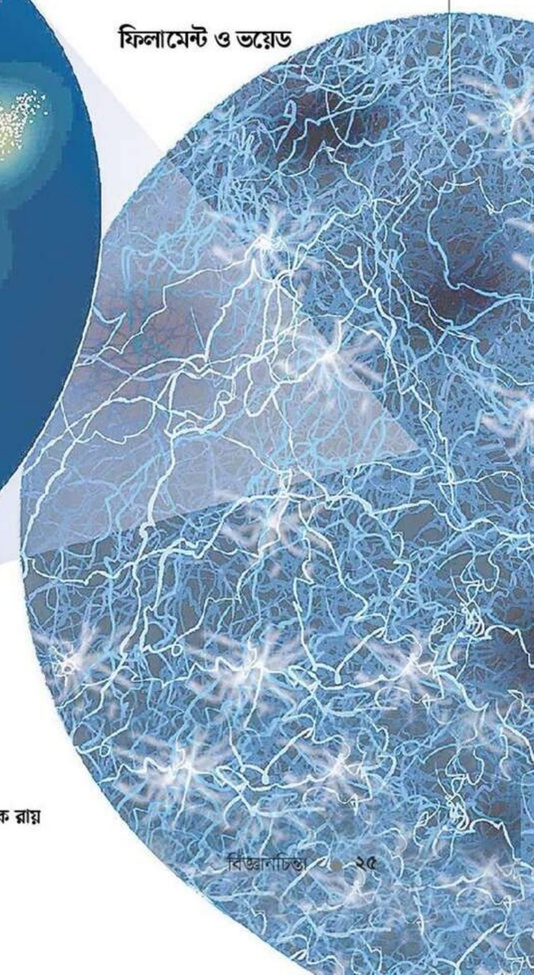

ফিলামেন্ট ও ভয়েড

পৃথিবী থেকে কসমিক ওয়েব

আমরা যদি মহাবিশ্বকে অনেক দূর থেকে দেখতে পেতাম, তাহলে বিশাল এক জালের মতো গঠন দেখতাম, যেখানে গ্যালাক্সি আর গ্যাস পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে আছে। একে বলা হয় কসমিক ওয়েব বা মহাজাগতিক জাল।

আকার ও দূরত্ব

সৌরজগতের বাইরের দূরত্ব এত বেশি যে তা মাপার জন্য নতুন একক লাগে। এর একটি হলো আলোকবর্ষ। আলো এক বছরে যতটা পথ অতিক্রম করে, তা-ই এক আলোকবর্ষ। এর মান প্রায় ৯.৫ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার। মহাবিশ্বের যতটুকু অংশ আমরা দেখতে পাই, তাকে বলে দৃশ্যমান মহাবিশ্ব। এই সীমা নির্ভর করে আলো কত দূর থেকে আমাদের কাছে আসতে পেরেছে, তার ওপর। কারণ বিগ ব্যাংয়ের পর থেকে যতটা সময় পেরিয়েছে, ততটুকু পথই পাড়ি দিতে পেরেছে আলো। এই সীমার বাইরে কী আছে, তা আমরা দেখতে পাই না। একে বলা হয় মহাজাগতিক আলোর দিগন্ত। পুরো মহাবিশ্ব আসলে কত বড়, তা কেউ জানে না। এটা অসীমও হতে পারে।

মহাবিশ্ব মানে যা কিছু আছে, আগে ছিল আর ভবিষ্যতে থাকবে—সবকিছুই। এতে আছে সব বস্তু ও স্থান, আলো আর নানা রকমের রশ্মি। সময়ও এর অংশ। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ—সবই মহাবিশ্বের অংশ।

মহাবিশ্বের আকার কেমন?

মহাবিশ্বের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। তাই এর সঠিক আকার বলা যায় না। তবে অনেক বিজ্ঞানীর মতে, মহাবিশ্ব সমতল বা চ্যাপটা হতে পারে। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, মহাবিশ্ব হতে পারে গোলাকার।

* মহাবিশ্বের দূরত্বগুলোকে সাধারণ স্কেলে মেপে দেখানো যায় না। এই ছবিতে প্রতিটি ভাগ আগের ভাগের চেয়ে ১০ গুণ বেশি দূরত্ব বোঝায়।

মহাবিশ্বের গঠন

মহাবিশ্ব যেসব বস্তু দিয়ে তৈরি, যেমন সবচেয়ে ভারী নক্ষত্র, গ্রহ, চাঁদ, এমনকি হালকা গ্যাস আর ধুলা—সবই একটা স্তরের মতো সাজানো। আর এই সব বস্তুকে একসঙ্গে ধরে রেখেছে মহাকর্ষ বল। প্রতিটি কাঠামোর ভেতরের বস্তুগুলো সাধারণত তার মাঝখানের কোনো একটা বস্তুকে কেন্দ্র করে ঘোরে। যেমন আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলো সূর্যের চারপাশে ঘোরে। তেমনি আমাদের গ্যালাক্সির সবকিছু এর মাঝে থাকা একটা ব্ল্যাকহোলকে কেন্দ্র করে ঘোরে। স্যাজিটেরিয়াস এ* নামে এই ব্ল্যাকহোলটি সূর্যের চেয়ে প্রায় ৪০ লাখ গুণ ভারী।

হাউ স্পেস ওয়ার্কস অবলম্বনে **অনিক রায়**

Job Solution BD Click Here to join the Channel

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

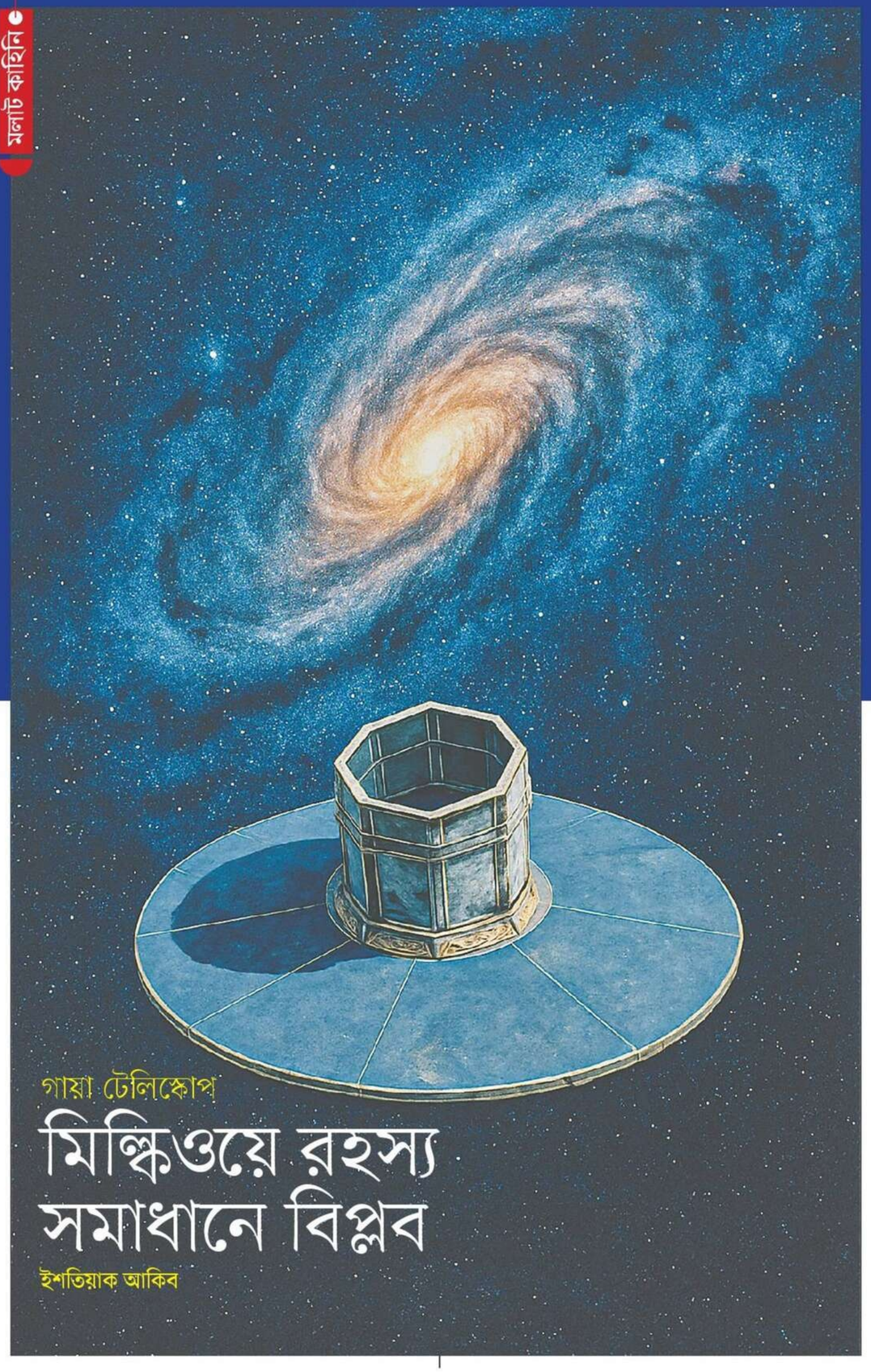

গায়া টেলিস্কোপ

মিল্কিওয়ে রহস্য সমাধানে বিপ্লব

ইশতিয়াক আকিব

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

মিল্কিওয়ের ত্রিমাত্রিক মানচিত্র তৈরি, ভর নির্ণয়সহ অনেক রহস্যের সমাধানে এক যুগ ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে গায়া টেলিস্কোপ। সম্প্রতি অবসরে গেছে এই নভোদুরবিন। এর তথ্য থেকে লেখা হয়েছে ১৩ হাজারের বেশি গবেষণাপত্র।

প্রায় তিন বছর ধরে প্যারিস অবজারভেটরির গায়া টিমে কাজ করছেন বাংলাদেশি গবেষক ইশতিয়াক আকিব। গায়ার তথ্য ব্যবহার করে দুটি গবেষণাপত্রে যুক্ত ছিলেন তিনি, নেতৃত্ব দিয়েছেন এর একটিতে। মিল্কিওয়ের ভর নির্ণয়বিষয়ক তাঁর আরেকটি গবেষণাপত্র প্রকাশের অপেক্ষায়। এই গবেষকের লেখায় উঠে এসেছে গায়ার বর্ণিল গবেষণা-জীবনের ইতিবৃত্ত, গুরুত্বসহ অনেক কিছু...

এক দশকের বেশি সময় ধরে পর্যবেক্ষণের পর অবশেষে থেমে গেছে গায়া টেলিস্কোপ।

২০১৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি (ইএসএ) পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে এল২ (L2) ল্যাগ্রাঞ্জ পয়েন্টের উদ্দেশে উৎক্ষেপণ করে টেলিস্কোপটি। আকাশজুড়ে প্রায় আড়াই বিলিয়ন বা ২৫০ কোটি বস্তু পর্যবেক্ষণের পর এর কর্মজীবন শেষ হলো। গত ২৭ মার্চ এর সিস্টেম বন্ধ করে অবসর-কক্ষপথে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহাকাশবিজ্ঞান, বিশেষ করে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে গায়ার অবদান অবিস্মরণীয়। এ টেলিস্কোপের ডেটা ব্যবহার করে এই পর্যন্ত ১৩ হাজারের বেশি গবেষণাপত্র লেখা হয়েছে।

গায়া টেলিস্কোপ পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির তারাদের বেগ নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা। মহাকাশের কোনো বস্তু আমাদের দিকে কত বেগে ধেয়ে আসছে বা দূরে সরে যাচ্ছে, তা পরিমাপ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এ জন্য ডপলার ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।

আমরা যেকোনো বস্তু থেকে আসা আলোকে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুসারে বেশ সহজেই ভাগ করতে পারি। তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুসারে আলো বা বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গের এই বিন্যাসকে বলে বর্ণালি। পর্যবেক্ষকের দিকে (বা উল্টো দিকে) কোনো বস্তুর বেগ যত বেশি, বর্ণালিতে তার গ্রাফ তত ডানে বা বাঁয়ে সরে যায়। বস্তু আমাদের দিকে এগিয়ে এলে অর্থাৎ বর্ণালিতে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ডানে সরে গেলে আলোটাকে খানিকটা নীলচে দেখায়। এর নাম আলোর নীল সরণ। আর বস্তু দূরে সরে গেলে অর্থাৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাঁয়ের দিকে সরে গেলে এর লাল সরণ বা লোহিত বিচ্যুতি হয়। এটাই ডপলার ইফেক্ট বা ডপলার ক্রিয়া।

কিন্তু তারাদের গতিপথ সরাসরি আমাদের দিকে (বা উল্টো দিকে) হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাই গতির বাকি অংশ (প্রপার মোশন) আকাশে ডানে-বাঁয়ে-ওপরে-নিচে খুব সামান্য পরিবর্তন হিসেবে ধরা দেয়। এই পরিবর্তন কত সামান্য, তা একটি উদাহরণ দিয়ে দেখানো যাক।

সূর্যের নিকটবর্তী একটি তারার নাম বার্নার্ড'স স্টার। সূর্যের সাপেক্ষে এর প্রপার মোশন সবচেয়ে বেশি। এক বছরে আকাশে এর অবস্থান এক ডিগ্রি কোণের ৩৬০ ভাগের এক ভাগ পরিবর্তন হয়। বুঝতেই পারছেন, এত সামান্য পরিবর্তন মাপা কত কঠিন। কিন্তু আমরা যদি আমাদের গ্যালাক্সির গঠন ও ইতিহাস বুঝতে চাই, তবে তারাদের গতির নিখুঁত পরিমাপ খুব জরুরি। কিন্তু এই পরিমাপ পৃথিবী থেকে করা খুব কঠিন। কারণ, পৃথিবীর নিজস্ব গতি ও বায়ুমণ্ডলের কারণে তারার গতির নিখুঁত পর্যবেক্ষণ বেশ দুরূহ।

গায়ার আগে নব্বইয়ের দশকে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির হিপার্কোস নামে একটি টেলিস্কোপকে তারাদের গতি মাপার জন্য পাঠানো হয়। হিপার্কোস প্রায় দুই মিলিয়ন বা ২০ লাখ তারার গতি মাপতে সক্ষম হয়। তবে এই তারাগুলো ছিল সূর্যের আশপাশের। কেননা কোনো তারা সূর্য থেকে যত দূরে, গতির কারণে তার অবস্থানের পরিবর্তন তত সামান্য হিসেবে ধরা দেবে।

হিপার্কোস টেলিস্কোপের সাফল্যের পর এর উত্তরসূরি হিসেবে গায়া মিশনের পরিকল্পনা করা হয়। গায়াকে পাঠানো হয় পৃথিবীর কক্ষপথের কাছে এল২ বিন্দুতে, যেখানে সূর্য ও পৃথিবীর মহাকর্ষ বল পরস্পরকে শূন্য করে দেয়। ফলে এখানে গায়া স্যাটেলাইট বেশ স্থিতিশীলভাবে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য, একই কারণে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপও পরে এল২ বিন্দুতে পাঠানো হয়েছে।

তারাদের অবস্থানের সামান্য পরিবর্তন মাপতে গায়া অবিরত ঘুরে ঘুরে পুরো আকাশের ছবি তুলতে থাকে। অনেক বছর ধরে তোলা এই ছবির তুলনা করে ওই সামান্য পরিবর্তনটুকু মাপা যায়। এই পুরো সময় গায়া নিজে এল২ বিন্দুর চারদিকে ও সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে। ফলে গায়া স্যাটেলাইটের নিজের নিখুঁত অবস্থান জানা আরও বেশি জরুরি। এ জন্য গায়া কোয়াসারের পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করে।

অনেক অনেক দূরের যেসব গ্যালাক্সির কেন্দ্রে বিশাল ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর আছে এবং সেই কৃষ্ণগহ্বরে ক্রমাগত গ্যাস পতিত হচ্ছে, সেগুলোই কোয়াসার। এতে পতিত গ্যাসের সংঘর্ষের ফলে প্রচুর আলোর বিকিরণ হয়। ফলে এই কোয়াসারগুলো আমাদের কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে হলেও তার আলো আমাদের কাছে ধরা পড়ে। আবার এই কোয়াসারগুলো এত দূরে যে আমাদের তুলনায় আকাশে তাদের অবস্থানের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। ফলে এই কোয়াসারদের অবস্থান মিলিয়ে প্রতি মুহূর্তে গায়া টেলিস্কোপের নিজের নিখুঁত অবস্থান নির্ণয় করা যায়। সেই তথ্য ব্যবহার করে তারাদের অবস্থানের প্রকৃত পরিবর্তন বের করা যায়।

গায়া সফলভাবে পুরো মিল্কিওয়ে, এমনকি মিল্কিওয়ের আশপাশের গ্যালাক্সি মিলে দুই বিলিয়ন বা ২০০ কোটির বেশি তারার নিখুঁত গতি মেপেছে। এই ডেটার ফলে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির নানা বিষয়ে আমাদের জ্ঞানে আমূল পরিবর্তন এসেছে।

প্রথমত, এত বিপুল পরিমাণ তারার তথ্য ব্যবহার করে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির নিখুঁত মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ফলে আমাদের গ্যালাক্সির বিভিন্ন অংশের ব্যাপারে পুরোনো ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, যেমন মিল্কিওয়ের

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

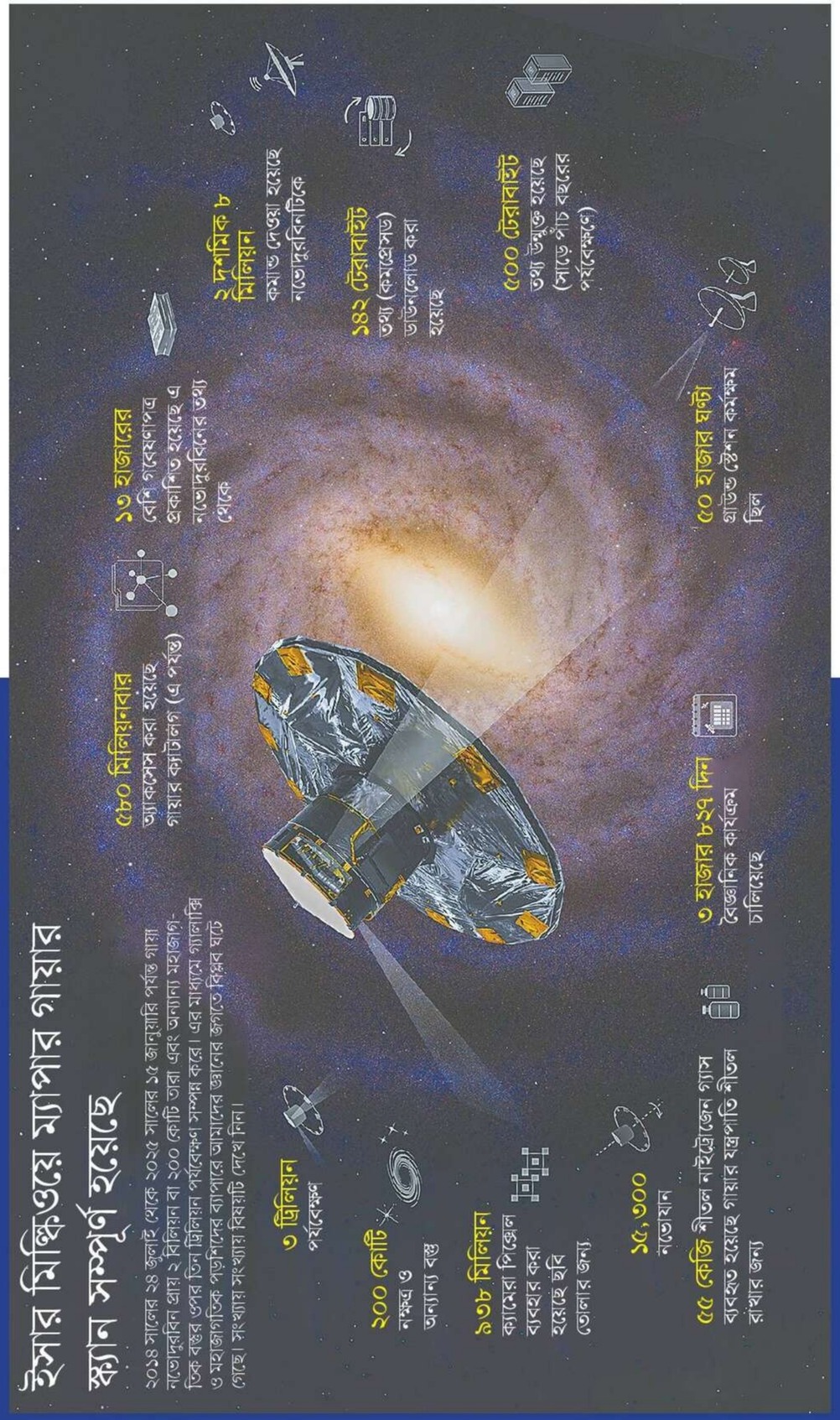

একনজরে গায়া যা কিছু পর্যবেক্ষণ করেছে : সৌরজগৎ, সূর্যের কাছাকাছি নক্ষত্র, মিল্কিওয়ে, নিকটস্থ আরও কিছু গ্যালাক্সি ইত্যাদি। পুরোটা সময় এই সবকিছুর নিখুঁত অবস্থান নির্ণয়ের জন্য টেলিস্কোপটি দূরের কোয়াসারের সহায়তা নিয়েছে।

ভেতরের দিকের তারারা একটি লম্বাটে বার (Bar) আকারে ছড়িয়ে আছে। অন্যদিকে বাকি তারা মোটামুটি পাতলা ডিস্ক আকারে রয়েছে। এই ডিস্কের তারাগুলো আবার সমানভাবে বিস্তৃত নয়; বরং অনেকগুলো স্পাইরাল আর্ম বা সর্পিল বাহুজুড়ে ছড়িয়ে আছে। তা ছাড়া এই ডিস্কে সামান্য ওয়ার্প (Warp) বা বক্রতা আছে, গায়ার ডেটায় এর প্রমাণ মিলেছে। এসব তথ্য থেকে বোঝা গেছে, মিল্কিওয়ের আকৃতি আসলে কেমন। এর ফলেই মিল্কিওয়ের নিখুঁত মানচিত্র বানাতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা।

দ্বিতীয়ত, তারাদের গতিবেগ থেকে আমরা শুরুতেই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ভর মাপতে সক্ষম হই। কোনো গ্যালাক্সিতে তারার পরিমাণ থেকে ভর হিসাব করলে তার যে গতি হওয়া উচিত; গ্যালাক্সির তারাদের, বিশেষ করে প্রান্তের দিকের তারাদের গতি তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি পাওয়া যায়। এ থেকেই বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, বিপুল পরিমাণ ভর ডার্ক ম্যাটার হিসেবে গ্যালাক্সিগুলোয় লুকিয়ে আছে। ডার্ক ম্যাটার বা গুপ্তবস্তু—বলা ভালো, অচিন বস্তু থেকে কোনো আলো আসে না। এগুলো আমাদের চেনা কোনো বস্তুর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়াও করে না। ফলে কোনো গ্যালাক্সিতে ডার্ক ম্যাটারের পরিমাণ তথা গ্যালাক্সির ভর মাপতে গেলে সেই গ্যালাক্সির প্রান্তের তারাদের গতি নিখুঁতভাবে মাপতে পারতে হয়। আমাদের গ্যালাক্সির প্রান্তের তারাদের গতি নিখুঁতভাবে মাপার কাজটা গায়া স্যাটেলাইটের আগে সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ আগে আমরা মিল্কিওয়ের ভর বা এতে ডার্ক ম্যাটারের পরিমাণ নিখুঁতভাবে মাপতে পারতাম না। গায়ার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। এতে জানা গেছে, এক অবাক করা তথ্য। গায়ার ডেটা অনুসারে, আমাদের গ্যালাক্সিতে ডার্ক ম্যাটারের পরিমাণ সাধারণ ম্যাটার তথা আমাদের চেনাজানা বস্তুর তুলনায় মাত্র দ্বিগুণ। তথ্যটা অবাক করা কেন? কারণ, আগে ধারণা করা হলো, মিল্কিওয়েতে ডার্ক ম্যাটারের পরিমাণ সাধারণ পদার্থের ৫ থেকে ১০ গুণ। ফলে মিল্কিওয়ের ভর যেখানে আগে ধারণা করা হতো সূর্যের ভরের তুলনায় প্রায় ট্রিলিয়ন গুণ বেশি, সেখানে আমাদের বর্তমান হিসাব হলো, এ ভর আসলে সূর্যের তুলনায় মাত্র ২০০ বিলিয়ন গুণ বেশি।

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির গঠন বিষয়ে গায়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছে, মিল্কিওয়ের এক অতীত সংঘর্ষ। বিগ ব্যাংয়ের

গায়া সফলভাবে পুরো মিল্কিওয়ে, এমনকি মিল্কিওয়ের আশপাশের গ্যালাক্সি মিলে দুই বিলিয়ন বা ২০০ কোটির বেশি তারার নিখুঁত গতি মেপেছে। এই ডেটার ফলে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির নানা বিষয়ে আমাদের জ্ঞানে আমূল পরিবর্তন এসেছে

Job Solution BD Click Here to Join the Channel
Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

পর যখন প্রথম গ্যালাক্সিগুলো গঠিত হয়, তখন মহাবিশ্বের আকার ছিল বেশ ছোট। ফলে গ্যালাক্সিদের মধ্যে প্রচুর সংঘর্ষ হতে থাকে। এ সময় অনেক গ্যালাক্সি মিলেমিশে একাকারও (Merge) হয়ে যায়। গায়া টেলিস্কোপের মাপা তারাদের গতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মিল্কিওয়ের সর্বশেষ বড় সংঘর্ষ ঘটে প্রায় ৯ থেকে ১০ বিলিয়ন (৯০০ থেকে ১ হাজার কোটি) বছর আগে। এ সময় মিল্কিওয়ের তিন থেকে চার গুণ ছোট একটি গ্যালাক্সি—এর নাম দেওয়া হয়েছে গায়া-সসেজ এন্সেলাডিউস—এসে মিল্কিওয়ের মধ্যে মিশে যায়। এই গ্যালাক্সির অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মতো তারার গতি মিল্কিওয়ের অন্য তারাদের গতি থেকে সামান্য ভিন্ন। এই ভিন্নতা খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমেই এই আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। এই বৃহৎ সংঘর্ষের কাছাকাছি সময়ে আরও একটি সংঘর্ষেরও কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে, যাকে অর্জুন/সেকোয়া/ইতোয়া নাম দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া প্রায় পাঁচ-ছয় বিলিয়ন বা পাঁচ থেকে ছয় হাজার কোটি বছর আগে স্যাজিটারিয়াস নামে একটি বামন গ্যালাক্সি প্রথমবারের মতো মিল্কিওয়ের কাছাকাছি আসে, যা এখনো সম্পূর্ণভাবে মিলিত হয়নি। গায়া টেলিস্কোপের ডেটা বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, মিল্কিওয়ের ডিস্কের বক্রতার জন্য সম্ভবত এই স্যাজিটারিয়াস বামন গ্যালাক্সিটি অন্তত আংশিক হলেও দায়ী।

গায়া শুধু মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিই নয়, মিল্কিওয়ের কাছাকাছি অবস্থিত বামন গ্যালাক্সিগুলোর তারাদেরও গতি মেপেছে। সেই গতি আমাদের আগের ধারণা থেকে অনেক বেশি। ফলে এই বামন গ্যালাক্সিগুলো সম্ভবত প্রথমবারের মতো মিল্কিওয়ের দিকে আসছে। এই গতি থেকে বামন গ্যালাক্সিদের কক্ষপথ হিসাব করে এদের বেশ কটি দল খুঁজে পাওয়া এবং আগের ও ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের হিসাব করা সম্ভব হয়েছে। বামন গ্যালাক্সিদের একটি দল মিল্কিওয়ের সঙ্গে প্রায় লম্বভাবে রয়েছে, যাকে বলা হয় ভাস্ট পোলার স্ট্রাকচার বা ভিপিওএস (Vast Polar Structure)। গায়া থেকে পাওয়া গতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, শুধু অবস্থান নয়, এদের অধিকাংশের গতিপথেও মিল আছে। এদের কক্ষপথ হিসাব করে দেখা গেছে, প্রায় ১২টি বামন গ্যালাক্সি আমাদের কাছের বড় গ্যালাক্সি অ্যান্ড্রোমিডা থেকে আসতে পারে।

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিভিত্তিক আবিষ্কারের বাইরেও গায়া টেলিস্কোপের নিখুঁত পরিমাপ ব্যবহার করে বেশ কিছু ব্ল্যাকহোল ও এক্সোপ্ল্যানেট খুঁজে পাওয়া গেছে। ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর থেকে কোনো আলো বের হয় না। এর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ এত প্রবল ও ভেতরে স্থান-কাল এমনভাবে দুমড়েমুচড়ে যায় যে আলো বা আর কিছুই বের হতে পারে না। এদিকে অন্য তারার পাশের গ্রহ থেকে আসা আলো এত কম যে তা তারার আলো থেকে আলাদা করা খুব দুরূহ কাজ। কিন্তু কোনো তারার পাশে এমন কোনো অদেখা সঙ্গী থাকলে তার মহাকর্ষের কারণে তারার পথ মসৃণ বা সরলরৈখিক না হয়ে স্পাইরাল বা সর্পিলাকৃতির হয়ে যায়। সেই পথ বিশ্লেষণ করে অদেখা সঙ্গীর ভর বের করা যায়। গায়ার ডেটায় সূর্য থেকে ৩৩ গুণ ভারী একটি ব্ল্যাকহোল পাওয়া গেছে—যদিও আগে ধারণা ছিল, এ রকম বিশাল আকারের ব্ল্যাকহোল থাকার সম্ভাবনা বেশ কম।

আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির কিছু তারাও গায়া টেলিস্কোপে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ নভোদুরবিন প্রায় ১৩ লাখ কোয়াসার পর্যবেক্ষণ করে আকাশে এর মানচিত্র তৈরি করেছে। এ ছাড়া গায়া ব্যবহার করে সৌরজগতের প্রায় দেড় লাখ গ্রহাণুর সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ নির্ধারণ করা হয়েছে, এমনকি কয়েক শ গ্রহাণুর সম্ভাব্য উপগ্রহাণুও খুঁজে পাওয়া গেছে।

এই গবেষণাগুলোর গুরুত্ব হয়তো পাঠক পড়তে পড়তে ইতিমধ্যেই বুঝে গেছেন। তবু সংক্ষেপে যদি বলি, গায়ার মাধ্যমে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির তারাদের গতিবেগ যেমন জানা গেছে, তেমনি মিল্কিওয়ের ভর, এর আকার-আকৃতি, মিল্কিওয়ের মানচিত্র, এর সঙ্গে অন্যান্য গ্যালাক্সির সংঘর্ষ, এসব সংঘর্ষের প্রভাবসহ আরও অনেক কিছু জানতে পেরেছি আমরা। অর্থাৎ এই একটি টেলিস্কোপ গত এক যুগে মিল্কিওয়ে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের জগতে এক বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। আমাদের সামনে মেলে ধরেছে মহাজাগতিক এই বাসস্থানটির অনেক রহস্য।

এখানেই শেষ নয়। গায়ার পর্যবেক্ষণ শেষ হলেও বিজ্ঞানীদের কাজ এখনো শেষ হয়নি। এত বিপুল পরিমাণ ডেটা প্রসেস করতেও বড় বড় সুপারকম্পিউটিং ফ্যাসিলিটির অনেক সময় লাগে। ফলে কয়েক বছরের ডেটা ধাপে ধাপে প্রকাশ করা হয়। এখন পর্যন্ত তিন দফা ডেটা প্রকাশ করা হয়েছে। গায়ার চতুর্থ দফার ডেটা প্রকাশিত হবে ২০২৬ সালের শেষ দিকে। আর পূর্ণ সাড়ে ১০ বছরের ডেটা প্রকাশ হতে হতে ২০৩০ সাল নাগাদ লাগতে পারে। ফলে গায়া থেকে ইতিমধ্যে পাওয়া অবিস্মরণীয় আবিষ্কারের তালিকা যে ক্রমেই বড় হতে থাকবে, তাতে সন্দেহ নেই।

লেখক : পিএইচডি গবেষক ও গায়া টিমের সদস্য, প্যারিস অবজারভেটরি

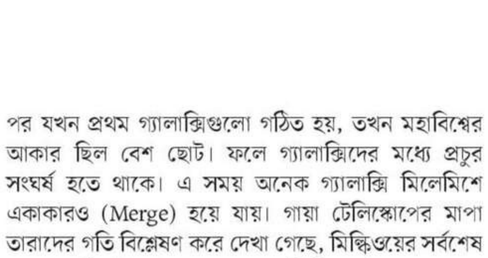

ল্যাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট ২ কী

গায়ার অবস্থান ছিল এল২ ল্যাগ্রাঞ্জ পয়েন্টে। এই ল্যাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট কী? সহজ করে বলা যায়, মহাকাশে নিরাপদ পার্কিং স্পট।

বড় কোনো বস্তুকে ঘিরে ছোট কোনো বস্তু যখন ঘুরতে থাকে, তখন বড় বস্তুটির দিকে মহাকর্ষীয় টান অনুভব করে।

ধরুন, আপনার নভোযানটি সূর্য ও পৃথিবীর মাঝেখানে কোথাও পার্ক করতে চাচ্ছেন। কয়েক বছর ওভাবে থাকলে দেখা যাবে, নভোযানটি কয়েক লাখ মাইল দূরে সরে গেছে। যদি সূর্যের কাছাকাছি কোথাও রাখেন, তাহলে যানটি সূর্যের দিকে এগিয়ে যাবে। আবার পৃথিবীর খুব কাছে রেখে গেলে এটি অনেকটা এগিয়ে আসবে পৃথিবীর দিকে। কিন্তু পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এমন পাঁচটি জায়গা আছে, যেখানে মহাকাশযানটি পৃথিবী বা সূর্যের টানে সেদিকে এগিয়ে যাবে না; বরং নিরাপদে নির্দিষ্ট কক্ষপথে থাকতে পারবে। এই পাঁচটি জায়গাকে বলা হয় পাঁচটি ল্যাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট। এই জায়গাগুলোতে পৃথিবী ও সূর্যের মহাকর্ষ এমনভাবে পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় যে মহাকর্ষীয় টান থাকে ভারসাম্যপূর্ণ।

গায়ার অবস্থান ছিল এল২-তে।

গ্রন্থনা : বিজ্ঞানচিন্তা ডেস্ক

Job Solution BD
Click Here to Join the Channel

গায়ার ভেতরে কী আছে

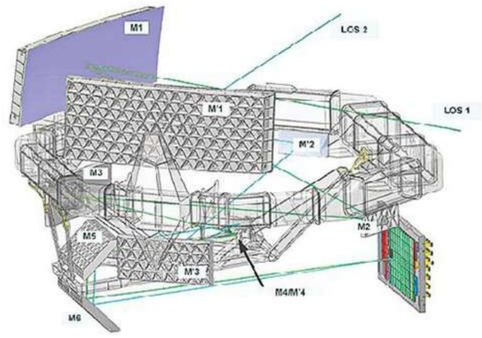

ভার

গায়া স্যাটেলাইটের যন্ত্রপাতিগুলো একটি ষড়ভুজাকৃতির অপটিক্যাল বেঞ্চে বসানো। এখানে দুটি টেলিস্কোপ—দুটিরই একটি সাধারণ ফোকাল প্লেন আছে। ফোকাল প্লেন মানে ফোকাসগামী যে তল প্রধান আয়নার সঙ্গে সমতলে থাকে।

প্রতিটি টেলিস্কোপ একটি অ্যাপারচারের মাধ্যমে মহাকাশের দিকে তাকায়। দুই পাশে ১.৭ গুণন ০.৬ ডিগ্রি পর্যন্ত দেখতে পায় প্রতিটি টেলিস্কোপ। এদের মাঝখানে রয়েছে স্থিতিশীল ১০৬.৫ ডিগ্রি কোণ।

আলো একটি অ্যাপারচার দিয়ে প্রবেশ করে উল্টো পাশের প্রধান আয়নায় (M1 ও M'1) পড়ে। সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে আরও কয়েকটি আয়নায় পড়ে—এভাবে আলো মোট ৩৫ মিটার পথ (বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'ফোকাস দূরত্ব') অতিক্রম করে। এভাবে আলো দুটি M4/M'4 বিম কম্বাইনারে (আলো একত্রীকরণ যন্ত্রে) একত্র হয়। তারপর ফোকাল প্লেনে পৌঁছায়।

ফোকাল প্লেনে রয়েছে কাস্টম-বিল্ট চার্জ-কাপলড ডিভাইসের (সিসিডি) একটি বড় মোজাইক, যেখানে মোট ১০৬টি সিসিডি আছে। এগুলো ডিজিটাল ক্যামেরায় ব্যবহৃত সেন্সরের মতো, তবে আরও অনেক বেশি উন্নত। এটি মোট প্রায় ১ গিগাপিক্সেল বা ১ হাজার কোটি পিক্সেলের যন্ত্র। সাধারণ ক্যামেরায় কয়েক লাখ পিক্সেল থাকে—এ থেকে তুলনামূলক একটা চিত্র পাওয়া যাবে।

নভোযানটি যখন ধীরে ঘোরে, তখন মহাজাগতিক বস্তু থেকে আসা আলো এই ফোকাল প্লেনের ওপর দিয়ে সরে যায়। এভাবে গায়া পুরো মহাকাশ স্ক্যান করে, নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করে পেছনের পটভূমির সঙ্গে মিলিয়ে। এ জন্য প্রতিটি বস্তু প্রায় ৭০ বার করে স্ক্যান করে গায়া।

নক্ষত্র পরিমাপের যন্ত্র

গায়ার অ্যাস্ট্রোমেট্রিক বা নক্ষত্রের অবস্থান, বেগ ইত্যাদি পরিমাপের যন্ত্রপাতি একসঙ্গে হাজারো নক্ষত্রের আপেক্ষিক দূরত্ব পরিমাপ করতে পারে।

ফোকাল প্লেনের অ্যাস্ট্রোমেট্রিক অংশে রয়েছে ৬২টি সিসিডি, যেগুলো গায়ার ঘূর্ণন ও স্ক্যান করার গতির সঙ্গে মিলে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার কারণে সময়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যও পরিমাপ করা হয়। আর নক্ষত্রের বেগ ও অবস্থান বুঝতে এ পরিমাপ অত্যন্ত জরুরি। প্রতিনিয়ত স্ক্যান করার মাধ্যমে গায়ার আপেক্ষিক কৌণিক পরিমাপ সংরক্ষিত থাকে, ফলে বেশ নিখুঁতভাবে নিজের ও বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান এটি নির্ধারণ করতে পারে।

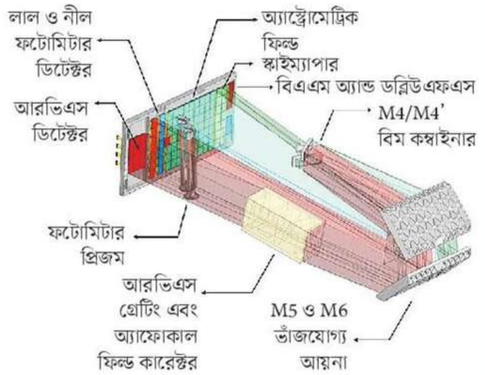

আলো পরিমাপ ও বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র

গায়ার ফোটোমেট্রিক বা আলো পরিমাপক যন্ত্রে রয়েছে দুটি স্বল্প রেজল্যুশনের ফিউজড-সিলিকা প্রিজম। এগুলো প্রবেশকৃত সব আলোকে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আলাদা করে। এর একটি নীল ফটোমিটার (৩৩০-৬৮০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কাজ করে), আরেকটি লাল ফটোমিটার (৬৪০-১,০৫০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কাজ করে)। প্রিজমগুলো টেলিস্কোপের শেষ আয়না (M6) এবং সিসিডি ফোকাল প্লেনের মধ্যে রয়েছে।

সঙ্গে রয়েছে রেডিয়াল ভেলোসিটি স্পেকট্রোমিটার (RVS)—বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র। এটি একটি ইনফ্রারেড গ্রেটিং স্পেকট্রোস্কোপ, ৮৪৭-৮৭৪ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে মধ্যম পর্যায়ের রেজল্যুশনে কাজ করে। এতে ১২টি বিশেষ সিসিডিসহ আরও কিছু যন্ত্র আছে। নক্ষত্রের রেডিয়াল ভেলোসিটি (সহজ বাংলায়, যে বেগে এটি আমাদের দিকে আসছে বা সরে যাচ্ছে) ১৭তম ম্যাগনিটিউড পর্যন্ত নিখুঁতভাবে নির্ণয় করতে পারে।

নীল ও লাল ফটোমিটার দুটি এবং আরভিএস—তিনটি একই ফোকাল প্লেনে বসানো। প্রতিটি সিসিডি আলাদা কলাম বরাবর আলো সংগ্রহ করে। তাই দুটি টেলিস্কোপ দিয়ে আসা আলো পরস্পরের ওপর উপরিপাতিত হয়ে আরভিএস ও সিসিডিতে পড়ে। আরভিএস, নীল ও লাল ফটোমিটার স্কাইম্যাপার ফাংশন ব্যবহার করে বিভিন্ন বস্তু শনাক্ত করে ও নিশ্চিত হয়।

একনজরে গায়া

ওজন প্রায় দুই টন। এতে পেলোড মডিউল বা ভারের পাশাপাশি রয়েছে একটি সার্ভিস মডিউল। এতে রয়েছে নানা ধরনের মেকানিক্যাল (যান্ত্রিক), স্ট্রাকচারাল (কাঠামোগত) এবং থার্মাল (তাপীয়) উপাদান। বিভিন্ন যন্ত্রপাতিকে সহযোগিতা করে এগুলো। এর মধ্যে আছে মাইক্রো-প্রপালশন সিস্টেম বা জ্বালানিব্যবস্থা, ভাঁজযোগ্য তাপরোধী ঢাল, পেলোডের জন্য তাপনিরোধক ছাউনি, সৌরকোষের প্যানেল ইত্যাদি। মডিউলটি নভোযানের ঘূর্ণন নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিভিন্ন যন্ত্রাংশে বিতরণ, ডেটা ব্যবস্থাপনা, পৃথিবীর সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ পরিচালনাসহ আরও অনেক কাজ করে।

তাপরোধী ঢালটিকে ইংরেজিতে বলা হয় সানশিল্ড, বাংলায় সূর্যরোধী ঢালও বলা যায়। সূর্যের প্রচণ্ড তাপ থেকে এটি নভোযানের সংবেদনশীল যন্ত্রগুলোকে রক্ষা করে।

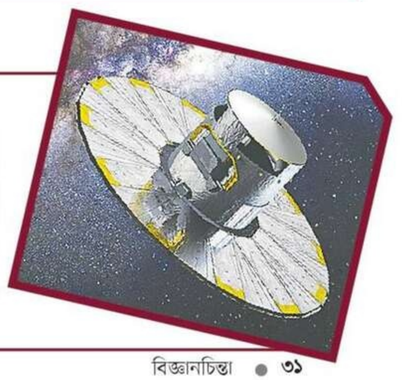

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র

আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্র ফোলা গোলাকার আকৃতির। এর বিস্তৃতি প্রায় ৮০০ আলোকবর্ষ। এখানে অনেক নক্ষত্র খুব ঘনভাবে রয়েছে। এর মাঝখানে রয়েছে স্যাজিটারিয়াস এ* নামের একটা সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল।

গ্যালাকটিক সেন্টার

আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্র সাধারণ আলোয় দেখা যায় না। কারণ, সেখানে প্রচুর ধুলা রয়েছে। তবে ইনফ্রারেড আর রেডিও ওয়েভের মতো অন্য রকম তরঙ্গ দিয়ে এই কেন্দ্র দেখা যায়। এই আলো ধুলার ভেতর দিয়েও যেতে পারে। আমাদের গ্যালাক্সির একেবারে মাঝখানে স্যাজিটারিয়াস এ* নামের এক শক্তিশালী রেডিও তরঙ্গের উৎস আছে। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি জিনিস। এক. স্যাজিটারিয়াস এ* (সংক্ষেপে Sgr A*) নামে একটা বিশাল ব্ল্যাকহোল। দুই. স্যাজিটারিয়াস এ ইস্ট নামে একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণের অবশেষ। আর তিন. স্যাজিটারিয়াস এ ওয়েস্ট গ্যাস ও ধুলার মেঘ। এই মেঘ ধীরে ধীরে ব্ল্যাকহোলে পড়ছে। গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক্স-রে আর গামা রশ্মিও বের হয়। এর মানে, ওখানে খুব শক্তিশালী কিছু ঘটছে, যাতে গ্যাস আর ধুলা ভয়ানক গতিতে ছুটে চলেছে।

আমরা কীভাবে জানি মিল্কিওয়ের কেন্দ্র কোথায়?
মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির সবকিছুই স্যাজিটেরিয়াস এ* নামের একটা বিশাল ব্ল্যাকহোলের চারপাশে ঘোরে। তাই ওটাই আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্র হতে বাধ্য।

মিল্কিওয়ের কেন্দ্র

আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রের বেশির ভাগ নক্ষত্র পুরোনো লাল দানব। তবে স্যাজিটারিয়াস এ* ব্ল্যাকহোলের খুব কাছে কিছু নতুন নক্ষত্র ঘুরছে। ধারণা করা হয়, ওই অঞ্চলে গ্যাসের ডিস্কে এসব নতুন নক্ষত্র জন্মেছে।

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি

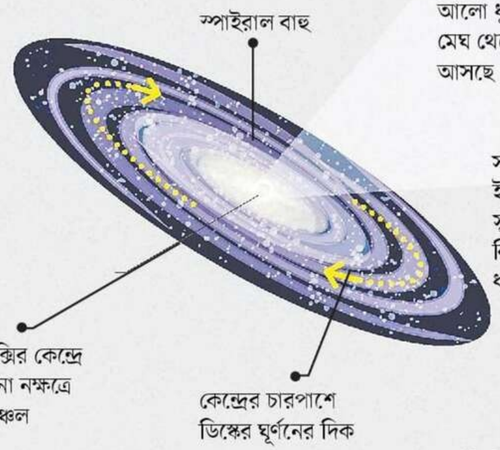

মিল্কিওয়ের কেন্দ্রে থাকা ব্ল্যাকহোলের ভর প্রায় ৪৩ লাখ সূর্যের ভরের সমান।

মিল্কিওয়ের হৃৎপিণ্ড

আমাদের গ্যালাক্সির মাঝখানে এমন একটা জায়গা আছে, যেখান থেকে প্রচণ্ড শক্তিশালী রেডিও তরঙ্গ বের হয়। সেখানে স্যাজিটারিয়াস এ* নামের একটা বিশাল ব্ল্যাকহোল আছে, যেটা চারপাশের সবকিছু নিজের দিকে টেনে নেয়। এই ব্ল্যাকহোল সরাসরি দেখা না গেলেও বিজ্ঞানীরা এর চারপাশে ঘুরতে থাকা নক্ষত্রগুলো দেখে অস্তিত্ব নিশ্চিত করেছেন। এর ভরও মেপেছেন তাঁরা।

স্যাজিটারিয়াস এ

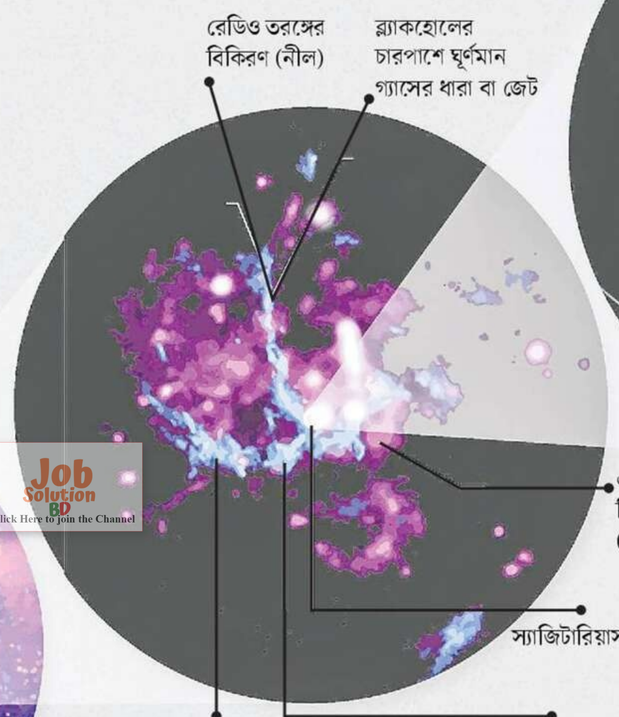

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

ব্ল্যাকহোলের চারপাশে ঘূর্ণমান নক্ষত্র

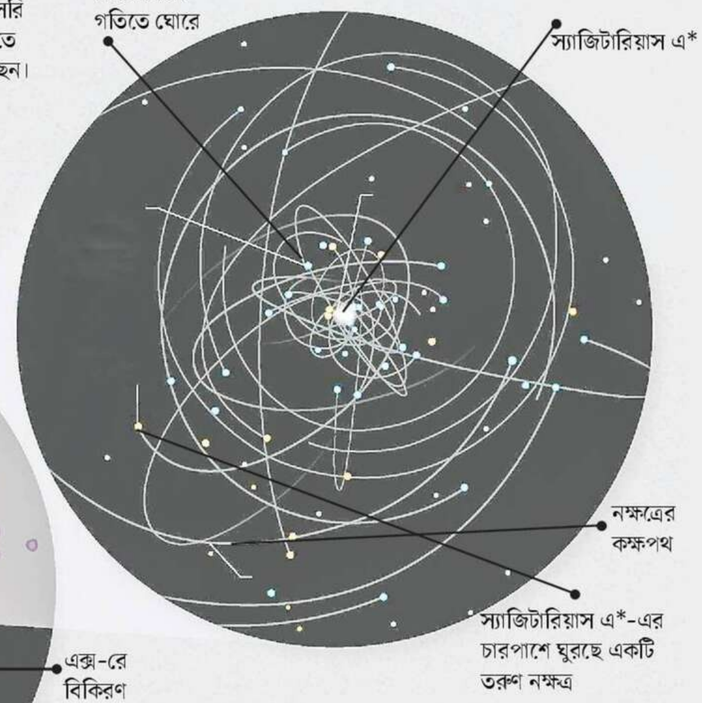

সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল

স্যাজিটেরিয়াস এ* নামের যে রেডিওর উৎসটা আছে, সেটা প্রায় ৪ কোটি ৪০ লাখ কিলোমিটার চওড়া। এটা আমাদের সূর্যের চেয়ে প্রায় ৩০ গুণ বড়! কিন্তু এর কেন্দ্রে যে ব্ল্যাকহোলটা আছে, তার ভর আমাদের সূর্যের চেয়ে প্রায় ৪০ লাখ গুণ বেশি। স্যাজিটেরিয়াস এ* সাধারণত শান্ত থাকে। তবে কয়েক বছর পরপর খুব শক্তিশালী এক্স-রের ঝলক দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, কোনো গ্রহাণুর মতো বস্তু ব্ল্যাকহোলে পড়ে ছিন্নভিন্ন হলে এমন বিকিরণ দেখা যায়।

গ্যালাক্সির কেন্দ্রে যা ঘটছে

গ্যালাক্সিকেন্দ্রের ওপরে-নিচে হাজারো আলোকবর্ষজুড়ে গ্যাসের বিশাল দুটি বাহু। এক্স-রে বিকিরণকারী গ্যাস যেন ধাক্কা দিয়ে বাহু দুটিকে লম্বা পথে ঠেলে দিয়েছে। এই গ্যাসীয় বুদবুদগুলোর সন্ধান পেয়েছে ফার্মি নভোযান। ওই গ্যাস থেকে বেরোনো গামা রশ্মিও শনাক্ত করেছে (গামা রশ্মি হলো বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের সবচেয়ে শক্তিশালী রূপ)।

বিকিরণের উৎস

গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে যে বিকিরণ বের হচ্ছে, তা কিছু বস্তুর নড়াচড়ার ফল। হয়তো কণার জেট বা বহু বছর আগে তৈরি হওয়া নক্ষত্রের বিস্ফোরণ থেকে ছড়ানো গ্যাস। এ সবই সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল স্যাজিটারিয়াস এ* থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আর তাতেই তৈরি হচ্ছে এই বিকিরণ।

হাউ স্পেস ওয়ার্কস অবলম্বনে **লিটন রায়**

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

কমিকস

কী ও কেন?

চাঁদের আকাশ কি পূর্ণিমায় আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে?

আব্দুল কাইয়ুম আঁকা : **অনিন্দ্য মুন্তাসির**

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

চন্দ্রজয়ী প্রথম নারী

পর্ব : ৯

ব্রাড গান ও স্টিভেন লিস্ট | ভাষান্তর : কাজী আকাশ
আঁকা : ব্রেন্ট ডোনোহোর ও কেইটলিন রিড

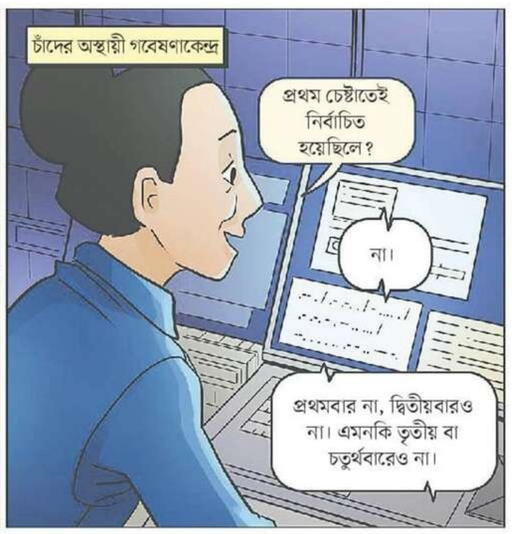

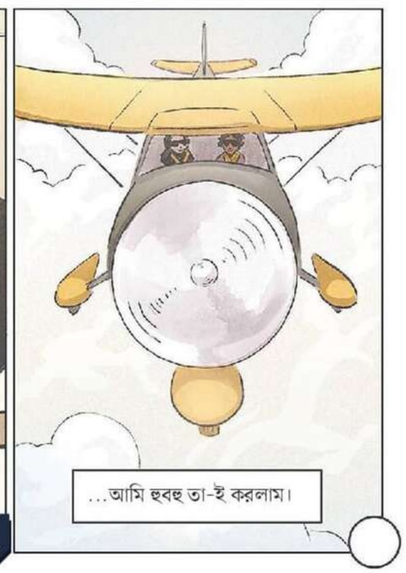

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

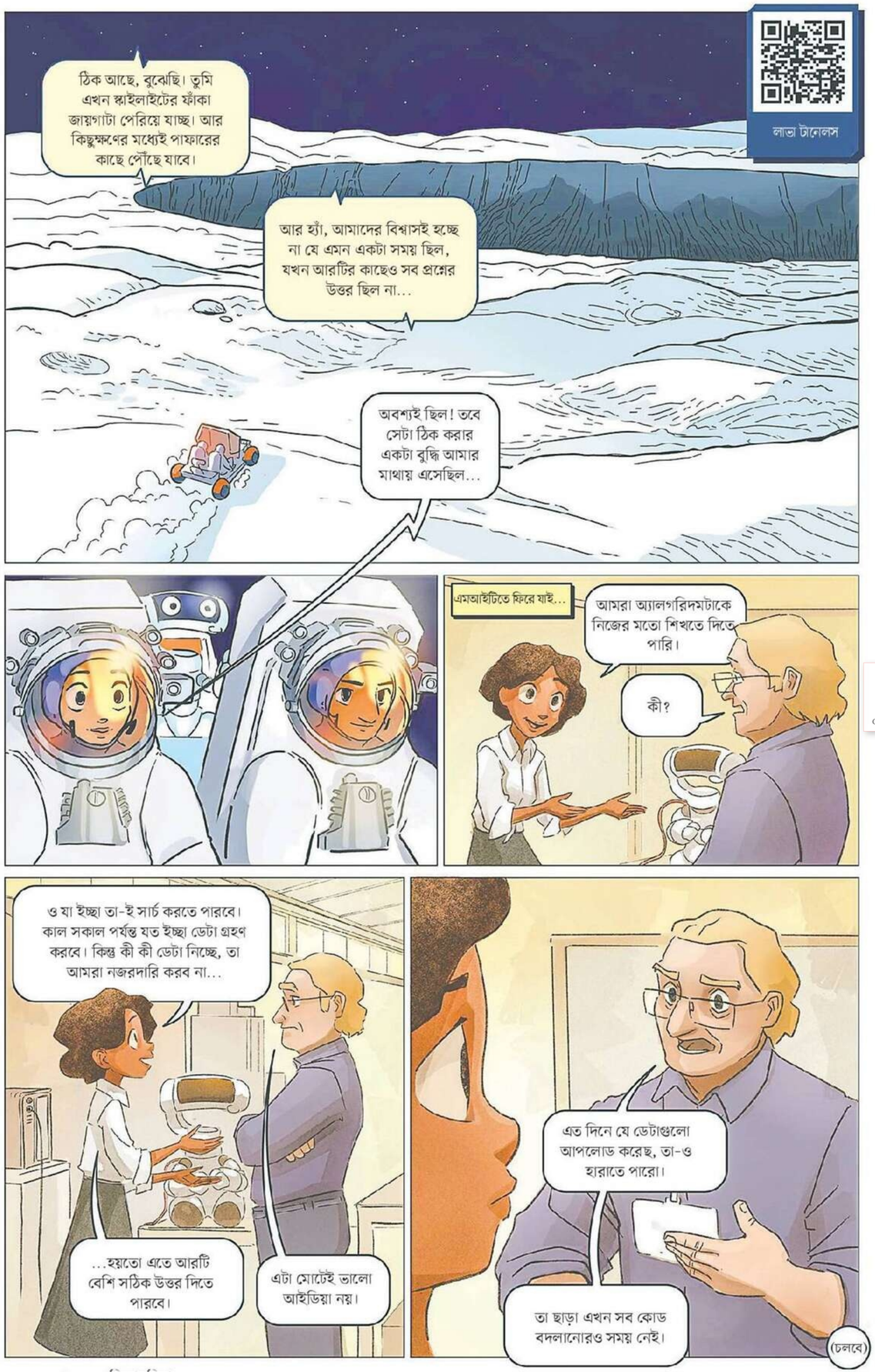

সাক্ষাৎকার

‘মানুষ যা ভাবতে পারে, তা করতেও পারে’

—সুনিতা উইলিয়ামস
নভোচারী, নাসা

সুনিতা উইলিয়ামস নাসার নভোচারী। গত বছর মাত্র আট দিনের জন্য আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে গিয়েছিলেন। কিন্তু নভোযানে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় প্রায় ৯ মাস কাটাতে হয়েছে তাঁকে মহাকাশে। তাঁর সঙ্গী ছিলেন আরেক মার্কিন নভোচারী বুচ উইলমোর। গত ১৮ মার্চ তাঁরা পৃথিবীতে ফিরেছেন। ফেরার পর সুনিতা এক সাক্ষাৎকারে মহাকাশ ভ্রমণ নিয়ে তাঁর ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলেছেন। *ফরচুন* ম্যাগাজিন থেকে সেই সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ সহজ ভাষায় প্রকাশিত হলো।

পাঠকদের জন্য সাক্ষাৎকারটি অনুবাদ করেছেন কাজী আকাশ।

Job Solution BD
Click Here to join the Channel
Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

প্রশ্ন : মহাকাশে কেন যেতে হবে? আর এখনই কেন?
সুনিতা উইলিয়ামস : মানুষ জন্মগতভাবেই কৌতূহলী। সব সময় নতুন কিছু খুঁজে বের করতে চায়। আমাদের সবার মধ্যেই কৌতূহল আছে। হয়তো সমাজের চাপে আর চারপাশের নানা কারণে সেটা কিছুটা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু আমরা সবাই কৌতূহলী এবং নতুন কিছু জানতে চাই। মহাকাশ মানুষকে আশার আলো দেখায়। নিজেদের চেয়ে বড় কিছু ভাবতে ও বুঝতে শেখায়।

প্রশ্ন : মহাকাশে গিয়ে আমরা আসলে কী জানতে চাই?
সুনিতা উইলিয়ামস : আমরা জানতে চাই, মহাবিশ্বে আমাদের স্থান কোথায়। পৃথিবীতে আমরা শুধু নিজেদের কাজ আর ছোটখাটো জিনিস নিয়েই ব্যস্ত থাকি। কিন্তু মহাকাশে গেলে বোঝা যায়, পৃথিবীটা একটা ছোট্ট দ্বীপের মতো। সেখানে মাথায় গভীর সব চিন্তা আসে, মনে অনেক দার্শনিক প্রশ্ন জাগে—আমাদের উদ্দেশ্য কী? এই পৃথিবীতে আমাদের ভবিষ্যৎ কী?

প্রশ্ন : সে জন্যই কি মঙ্গলে যাওয়ার এই চেষ্টা?
সুনিতা উইলিয়ামস : আমরা যদি মঙ্গলে যেতে পারি, তাহলে হয়তো জানতে পারব, ভবিষ্যতে পৃথিবীর কী হবে। পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখতে কী করা দরকার, সে বিষয়ে হয়তো নতুন ধারণা পাব আমরা। আপাতত মঙ্গল পর্যন্ত যাওয়াটা আমাদের লক্ষ্য।

প্রশ্ন : আর এর শুরুটা হবে চাঁদে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে?
সুনিতা উইলিয়ামস : আমি ঠিক জানি না, আমরা কীভাবে মঙ্গলে যাব। কেউই হয়তো এখনো পুরোপুরি জানেন না। কিন্তু চাঁদে স্থায়ীভাবে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে করতে আমরা অনেক কিছু শিখব। প্রকৌশল, প্রযুক্তি, এমনকি মানুষ হিসেবে আমরা কীভাবে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করি, ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে মহাকাশে যাওয়ার সময় কী রকম সমস্যার মুখোমুখি হব, সেগুলো কীভাবে সমাধান করতে হবে, তা-ও শিখব।

প্রশ্ন : শেষ পর্যন্ত তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে?
সুনিতা উইলিয়ামস : চাঁদ থেকে মঙ্গলে যাওয়াই আপাতত আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। আমরা স্থায়ীভাবে চাঁদে ফিরতে চাই। মানে চাঁদের মাটিতে আমাদের একটা স্থায়ী ঘাঁটি লাগবে। সম্ভবত একটা মহাকাশ স্টেশন বানাতে হবে। সে জন্য আমরা (চাঁদের কক্ষপথে) গেটওয়ে তৈরি করছি। সেটা চাঁদ এবং চাঁদ থেকে দূরে যাওয়ার ক্ষেত্রে মহাকাশ স্টেশন বা ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সেখানে আমরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব। এসব ভাবলে সায়েন্স ফিকশনের মতো মনে হয়। পাগলামিও মনে হতে পারে। কিন্তু আমি যখন নাসায় যোগ দিই, তখন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনও একটা পাগলাটে ধারণা ছিল। আমরা সেটা করে দেখিয়েছি। অর্থাৎ মানুষ যা ভাবতে পারে, তা করতেও পারে।

প্রশ্ন : কবে আমরা চাঁদে এবং তারপর মঙ্গলে ঘাঁটি বানাতে পারব?

সুনিতা উইলিয়ামস : এটা সময়সাপেক্ষ, শিগগিরই হবে না। সম্ভবত এই দশকের মধ্যেই মানুষ আবার চাঁদে যাবে। যত দ্রুত সম্ভব চাঁদে স্থায়ী ঘাঁটি গাড়তে হবে। সেখানে মানুষ যাওয়ার পর বোঝা যাবে, কাজটা কতটা কঠিন। মনে রাখবেন, আমরা অ্যাপোলো প্রোগ্রামের মতো একই জায়গায় যাচ্ছি না। আমরা যাচ্ছি দক্ষিণ মেরুতে। তাই কক্ষপথটা আলাদা। পরিবেশও। এটা একটু বেশি কঠিন।
বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে চাঁদের মতো পরিবেশে নভোযানের যন্ত্রপাতি ফেলে রেখে পরীক্ষা করছেন, সেগুলোতে কেমন পরিবর্তন হচ্ছে। এতে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারবেন, চাঁদের মাটিতে তাঁদের কী করতে হবে। এসব ছোট ছোট কাজের মাধ্যমেই ভবিষ্যতের মঙ্গলযাত্রার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন : চাঁদে যাওয়া কি তখন নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠবে?
সুনিতা উইলিয়ামস : আমরা চাই, চাঁদে যাওয়াটা নিয়মিত এবং সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠুক। চাঁদ হবে মহড়ার মঞ্চ। সেখানে মহাকাশ স্টেশন থাকবে, মানুষ থাকবে, তারা গবেষণা করবে। এরপর আমরা মঙ্গল গ্রহে যাত্রার প্রস্তুতি নেব। আমরা এখন পৃথিবীর কাছাকাছি কক্ষপথে যেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমরা জানি, কীভাবে এটা করতে হয়—রকেটে যেতে হয়। রকেটযাত্রা বিপজ্জনক ঠিক, কিন্তু আমরা জানি এটা কীভাবে করতে হয়। এখন রকেটনির্মাতা কোম্পানিগুলো নিয়মিত চাঁদে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারব।

প্রশ্ন : বেসরকারি মহাকাশ সংস্থাগুলোর ভূমিকা এ ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ?
সুনিতা উইলিয়ামস : প্রথমে রাশিয়া পর্যটকদের নিয়ে মহাকাশে যাওয়া শুরু করেছিল। পরে নাসাও বাণিজ্যিকভাবে মহাকাশে মালামাল পাঠানো শুরু করে। সেটার সঙ্গে আমরা ভালোভাবেই মানিয়ে নিয়েছি। এরপর তো আন্তর্জাতিক মহাকাশ

নভোচারী সুনিতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোর

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

স্টেশনে নভোচারী পাঠাতেও বেসরকারি কোম্পানিগুলো সাহায্য করছে। এসব শুরু হয়েছিল ২০০০ সালের দিকে। তবে গত এক দশকে এটা সত্যিই অনেক বেড়েছে।

প্রশ্ন : সাধারণ মানুষের জন্য কি এর কোনো উপকারিতা আছে?
সুনিতা উইলিয়ামস : বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মতো করে কাজ করতে পারছে। এতে খরচ কমছে এবং তারা নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করছে। তাই উৎপাদনপ্রক্রিয়া, বড় আকারে ধাতুর থ্রি-ডি প্রিন্টিং, ফ্রিকশন স্টিয়ার ওয়েল্ডিং এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রক্রিয়ায় অনেক উন্নতি হয়েছে।

প্রশ্ন : প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কতটা সাহায্য করছে?
সুনিতা উইলিয়ামস : আজকের দিনে একটা স্মার্টফোনেও স্পেস শাটলের চেয়ে বেশি কম্পিউটিং শক্তি থাকে। নতুন প্রযুক্তি, উপকরণ, জ্বালানির ব্যবহার—সবই উন্নত হচ্ছে। এসব খাতে বেসরকারি উদ্ভাবনের জায়গা রয়েছে। মার্কিন সরকারও পুরস্কার স্বরূপ এসব কোম্পানির সঙ্গে বড় বড় চুক্তি করেছে।

প্রশ্ন : মহাকাশযাত্রার কোন খাতগুলোতে ভবিষ্যতে সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন হবে?
সুনিতা উইলিয়ামস : রকেট, বলা বাহুল্য। তবে এর নানা উপকরণ, স্পেসসুট, ল্যান্ডার—সবকিছু উন্নত করতে হবে। আপনি যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য কাউকে কোনো জায়গায় পাঠান, তাহলে সেই ব্যক্তির প্রতিটি ছোট ছোট সমস্যাও সমাধান করতে হবে। খাবার, ব্যায়াম, পোশাকের মতো সব সমস্যার সৃজনশীল সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। শিশুদের আমি প্রায়ই বলি, 'তুমি যেকোনো কিছু করতে পারো, এমনকি মহাকাশের ব্যবসা নিয়েও ভাবতে পারো। শুধু নভোচারী, ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হতে হবে, এমন কোনো কথা তো নেই।'

প্রশ্ন : কিন্তু মহাকাশের ব্যাপারে আমরা এখনো কত কিছু জানি না...
সুনিতা উইলিয়ামস : হ্যাঁ, আমরা মহাকাশ থেকে সুস্থভাবে ফিরে এসেছি ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘদিন কেউ মহাকাশে থাকলে কী হয়, তা জানতে হবে। চাঁদ খুব বেশি দূরে নয়, তা-ও সেই মিশন কয়েক সপ্তাহ দীর্ঘ হয়। নভোচারীরা এই পুরো সময়টা মাইক্রোগ্র্যাভিটিতে থাকেন। মঙ্গলযাত্রা অনেক দীর্ঘ, ওখানে অনেক দিন থাকতে হবে। মঙ্গলে পৃথিবীর মতো মাধ্যাকর্ষণও থাকবে না। তাই আমাদের এখনো অনেক কিছু শিখতে হবে।

সুনিতা উইলিয়ামসের মহাকাশে ৯ মাস

৬ মে ২০২৪
স্টারলাইনার প্রথমবার মহাকাশে যাওয়ার চেষ্টা করে। শেষ মুহূর্তে রকেটের অক্সিজেন ভালভে সমস্যা হয়, মিশন বাতিল করা হয়।

১৪ মে ২০২৪
নতুন ভালভ লাগানো হয়। স্টারলাইনার উৎক্ষেপণের নতুন ডেট ঠিক করা হয় ২১ মে।

২৩ মে ২০২৪
সার্ভিস মডিউলে হিলিয়াম লিক ধরা পড়ে। উৎক্ষেপণের ডেট বদলে করা হয় ১ জুন।

১ জুন ২০২৪
স্টারলাইনার উৎক্ষেপণের কয়েক মিনিট আগে যাত্রা বাতিল করা হয়। কারণ, কম্পিউটারে উৎক্ষেপণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামটা ঠিকমতো কাজ করছিল না।

৫ জুন ২০২৪
শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা থেকে স্টারলাইনার রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়। ব্যারি উইলমোর ও সুনিতা উইলিয়ামস ছিলেন এ নভোযানে। তাঁদের ফেরার তারিখ ঠিক করা হয় ১৪ জুন।

৬ জুন ২০২৪
রকেটে হিলিয়াম লিক এবং ইঞ্জিনের সামান্য সমস্যা থাকা সত্ত্বেও নিরাপদে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের সঙ্গে ডকিং (জুড়ে যায়) করে।

১১ জুন ২০২৪
নাসা জানায়, স্টারলাইনারে ছোট পাঁচটা লিক দেখা গেছে, এতে করে ফেরা সম্ভব নয়। ফলে দুই নভোচারীকে ১৮ জুন পর্যন্ত মহাকাশে রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

১৪ জুন ২০২৪
১৪ জুনের পরিবর্তে ২২ জুন সুনিতাদের বাড়ি ফেরা নিশ্চিত করে নাসা।

১৮ জুন ২০২৪
তাঁদের পৃথিবীতে ফেরার তারিখ আবার পিছিয়ে ২৬ জুন করা হয়। স্টারলাইনারের সমস্যা তখনো মেটেনি।

২১ জুন ২০২৪
আবার নভোচারীদের ফেরা পিছিয়ে যায়। কারণ, আগে থেকে ঠিক করা ছিল, নভোচারীরা মহাকাশ স্টেশনের বাইরে হেঁটে (স্পেসওয়াক) কিছু কাজ করবেন।

৭ আগস্ট ২০২৪
নাসা জানায়, উইলমোর আর উইলিয়ামস হয়তো স্টারলাইনারে না ফিরে অন্য কোনো নভোযানে ফিরবেন।

২১ জুন ২০২৪
আবার নভোচারীদের ফেরা পিছিয়ে যায়।

২৪ আগস্ট ২০২৪
নাসা নিশ্চিত করে, দুই নভোচারী পৃথিবীতে ফিরবেন ২০২৫ সালে, অন্য কোনো নভোযানে।

৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪
স্টারলাইনার ফিরে আসে পৃথিবীতে।

৮ মার্চ ২০২৫
নাসা জানায়, তাঁরা ক্রু-১০ মিশনে পৃথিবীতে ফিরবেন। এই মিশনে ফিরবেন সুনিতা উইলিয়ামস, ব্যারি উইলমোর, নিক হ্যাগ ও আলেকজান্ডার গরবুনভ।

১৪ মার্চ ২০২৫
যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয় ক্রু-১০ মিশন।

১৮ মার্চ ২০২৫
সুনিতা ও ব্যারি দীর্ঘ ৯ মাস পর পৃথিবীতে ফেরেন। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীতে ফিরতে সময় লাগে প্রায় ১৭ ঘণ্টা।

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

পদার্থবিদ্যা

নিউক্লিয়ার বলের কাহন

পর্ব ৫

আরশাদ মোমেন

কেমন করে সূচনা হলো কণাত্বরক যন্ত্রের? এর প্রয়োজনই-বা পড়ল কেন? পরমাণুর ভেতরে উঁকি দেওয়ার প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানীদের এই নবযাত্রার পেছনের কথা...

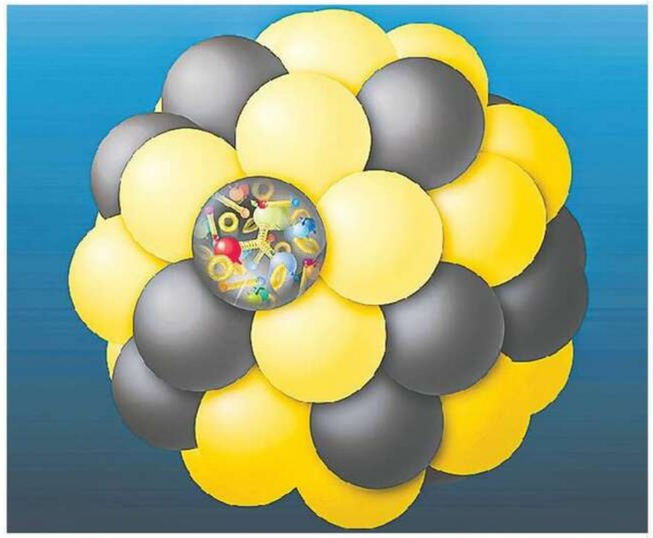

মধ্যযুগেও মানুষ ভাবত, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আর তারকামণ্ডলী একটা উপুড় করা বাটির গায়ে কতগুলো আলোর উৎস। বলা বাহুল্য, গ্যালিলিওর দুরবিন দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করেছিল। তারপরও মহাকাশবিজ্ঞানে আরও কত যে চমক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, তা ১৯২০ সালেও বিজ্ঞানীরা বোধ হয় অনুমান করতে পারেননি। এই সময়ের মধ্যে আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতা প্রণয়ন শেষ করে ফেলেছিলেন। মহাবিশ্বের জ্যামিতি কী হতে পারে, তা নিয়ে তাঁর পাশাপাশি অন্যরাও গবেষণা চালাচ্ছিলেন। সেখানে বড় সমস্যা ছিল, মহাবিশ্বের মধ্যে কী কী উপাদান আছে, সে ব্যাপারে কারও পরিষ্কার ধারণা ছিল না। অবশ্য এক শ বছর পরও যে আমরা এই প্রশ্নের সদুত্তর জানি, তা কিন্তু নয়!

এখন, আমরা এই পর্যায় পর্যন্ত যা জানি, তা সংক্ষেপে আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

ক. পরমাণুর কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস রয়েছে, যা পরমাণুর ভরের প্রায় সবটা ধারণ করে। এই নিউক্লিয়াসের ভেতরে রয়েছে প্রোটন ও নিউট্রন, যাদের আমরা দলগতভাবে নিউক্লিয়ন নামে ডাকব। আর নিউক্লিয়াসের চারপাশে রয়েছে কতগুলো কক্ষপথে চলমান ইলেকট্রন।

খ. নিউক্লিয়নগুলোর মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী আকর্ষণ বিদ্যমান, যার উদ্ভবের জন্য মেসন নামের কণার আদান-প্রদান দায়ী।

গ. পৃথিবীর বুকে পাওয়া তেজস্ক্রিয় ভারী মৌল ছাড়া পৃথিবীর বাইরে থেকেও কসমিক রশ্মি আসছে। এর প্রভাব তেজস্ক্রিয় কণার মতোই। এই কণাগুলো অন্যান্য নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় প্রতিকণা তৈরি করতে পারে। এর উপস্থিতির ভবিষ্যদ্বাণী কোয়ান্টাম সমীকরণের মাধ্যমেই করা হয়েছিল।

আগেই বলেছি, চৌম্বকক্ষেত্রে চলমান কসমিক বা মহাজাগতিক রশ্মির ছবি পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমেই কার্ল অ্যান্ডারসন ইলেকট্রনের প্রতিকণা পজিট্রন আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি ও তাঁর সহকর্মী নেড্ডারমেয়ার ১৯৩৬ সালে আরেকটি নতুন কণা আবিষ্কার করলেন। চৌম্বকক্ষেত্রে এই নতুন কণার গতিপথের বক্রতা দেখা গেল। সেটা ওই একই চৌম্বকক্ষেত্রে পাওয়া প্রোটন ও ইলেকট্রনের গতিপথের বক্রতার মাঝামাঝি মানের। অর্থাৎ এই নতুন কণার ভর এ দুই প্রকার কণার মাঝামাঝি। এর মানে কি এই কণা জাপানি বিজ্ঞানী ইউকাওয়ার প্রস্তাবিত কণা, যার ভর ঠিক এই মাত্রারই হওয়ার কথা?

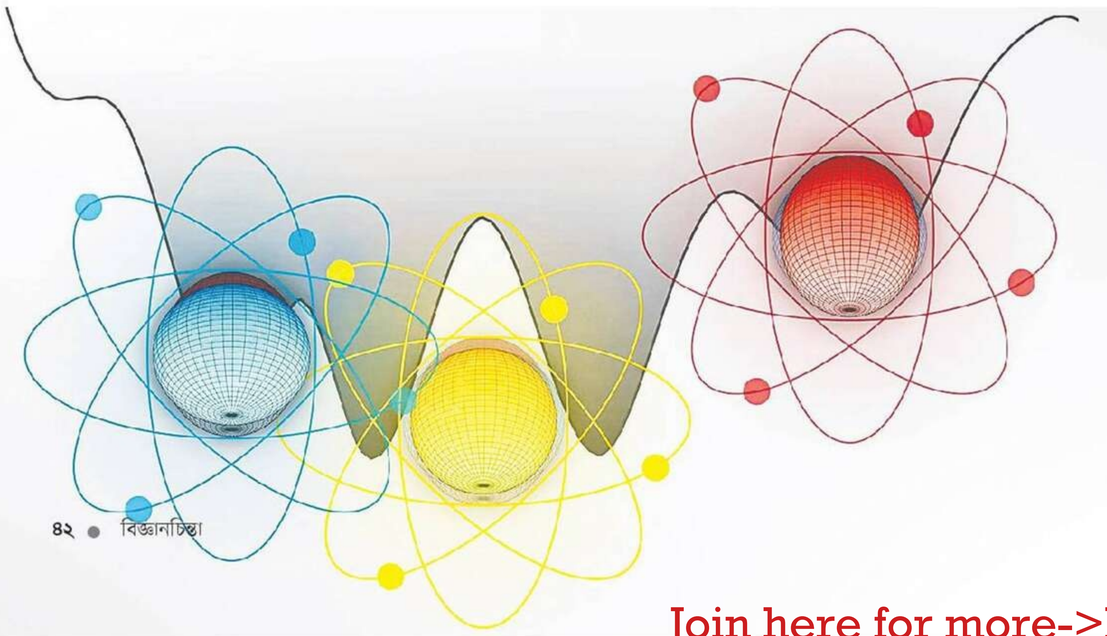

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

এর উত্তর পেতে বিজ্ঞানীদের অপেক্ষা করতে হলো আরও ১০ বছর। এটা বোঝার জন্য আমাদের কয়েকটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে। ইউকাওয়া যে মেসন কণার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার কাজ মূলত নিউক্লিয়াসে বিদ্যমান প্রোটন বা নিউট্রনগুলোর মধ্যে আকর্ষণ তৈরি করা। তাহলে নিউক্লিয়াসে এই মেসন কণাগুলো খুব সহজেই শোষিত হবে, ঠিক যেভাবে আলো (অর্থাৎ ফোটন কণা) কোনো কালো বস্তুর ওপর পড়লে শোষিত হয়।

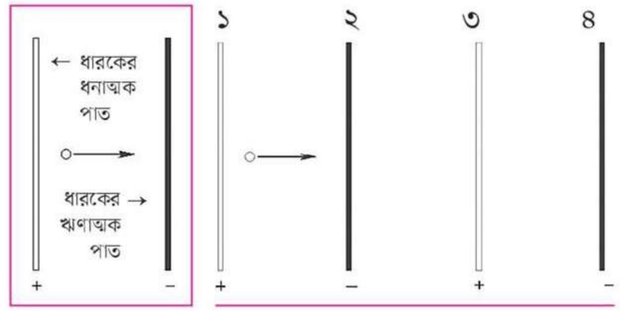

চিত্র ১ (বাঁয়ের ছবি) এবং চিত্র ২ : বাঁয়ের ছবির মতো কিছু ধারক পরপর সাজিয়ে রাখা

কার্ল অ্যান্ডারসন ও নেড্ডারমেয়ার যে 'মেসন' কণা দেখতে পেলেন, তা যদি আদতেই ইউকাওয়ার মেসন হয়ে থাকে, তাহলে তো তার নিউক্লিয়াসে শোষিত হওয়ার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপর একদল ইতালীয় পদার্থবিদ দেখালেন, এই মেসন কণাগুলো লোহার পাতের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় যে মাত্রায় শোষিত হওয়ার কথা, তার চেয়ে অনেক কম মাত্রায় শোষিত হচ্ছে। এই পরীক্ষাগুলো তাঁরা ১৯৪০ সালের দিকে শুরু করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সেটা শেষ করতে পারেননি। এ ব্যাপারে কথিত আছে, গবেষণার যন্ত্রপাতি রক্ষার জন্য এই ইতালীয় বিজ্ঞানীরা সেগুলোকে ইতালীয় গ্রামাঞ্চলে সরিয়ে নিয়েছিলেন। যাহোক তাঁদের গবেষণায় বোঝা গেল, অ্যান্ডারসনদের আবিষ্কৃত কণাটি আর যা-ই হোক, ইউকাওয়ার মেসন কণা নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বিজ্ঞানীরা যুদ্ধে ব্যবহৃত হবে, এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণায় মনোনিবেশ করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে তাঁদের মনোযোগ আবারও মৌলিক গবেষণায় ফিরে আসে। তবে এখানে পারমাণবিক বোমা তৈরির সময় যেসব প্রযুক্তি তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলোর প্রয়োগ ঘটায় দ্রুতই নতুন নতুন কণার আবিষ্কার ঘটতে থাকে। পরিস্থিতির এই দ্রুত 'উন্নতি'র পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল।

কসমিক রশ্মি নিয়ে কাজ করার প্রধান অসুবিধা ছিল, এর উৎসের ওপর আমাদের কোনো হাত ছিল না। অর্থাৎ আমরা ইচ্ছেমতো সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারতাম না অথবা কণাটির শক্তি কত হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না। বলতে গেলে, ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে উপযুক্ত কণার আগমনের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয় কসমিক কণা নিয়ে কাজ করা বিজ্ঞানীদের। এখন যেকোনো পরীক্ষণের ফলাফল মেনে নিতে হলে সেই পরীক্ষা শুধু একবার করলে হয় না, সেটার পুনরাবৃত্তি করতে হয় এবং কসমিক রশ্মির ক্ষেত্রে এই সুবিধা পাওয়া যায় না। ডেটার সংখ্যা কম হলে পরিসংখ্যানের নিরীক্ষা ভালো হয় না। যদিও কসমিক রশ্মিতে থাকা অনেক কণারই শক্তি ওই সময়ে পরীক্ষাগারে থাকা তেজস্ক্রিয় উৎসের শক্তি থেকে বেশ বেশি ছিল; তারপরও যাতে কসমিক রশ্মির ওপর নির্ভর না করতে হয়, সে জন্য কণাত্বরক যন্ত্র (Particle accelerator) উদ্ভাবন করা দরকার হয়ে পড়ল।

একদিক থেকে চিন্তা করলে সবচেয়ে সহজ কণাত্বরক হচ্ছে একটি সমান্তরাল পাত ধারক। কারণ, তার দুই পাতের মধ্যে যে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র থাকে, তা বৈদ্যুতিক চার্জবিশিষ্ট যেকোনো কণার বেগ বাড়ায়, ফলে তার গতিশক্তিকেও বাড়িয়ে দেয়। অবশ্যই চার্জটিকে তার বিপরীত চার্জবিশিষ্ট পাতের দিকে চালিত করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, এভাবে গতিশক্তি খুব বেশি মাত্রায় বাড়ানো যায় না। কারণ, কণায় যে শক্তি সঞ্চালন করা হয়, তা আসে দুই পাতের বিভব পার্থক্য থেকে (ঠিক যেমন ওপর থেকে পতনশীল বস্তুর গতিশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে)। আর এই বিভব পার্থক্য গবেষণাগারে ইচ্ছেমতো বৃদ্ধি করা যায় না। কারণ, একপর্যায়ে যেকোনো ধারক থেকে বৈদ্যুতিক ডিসচার্জ ঘটবেই। তাহলে আমরা কীভাবে কণার গতিশক্তির মান বাড়াতে পারি? একটা উপায় হতে পারে, আমরা উচ্চ বিভব পার্থক্যে রাখা একটি ধারক ব্যবহার না করে কম বিভব পার্থক্যে রাখা একাধিক ধারক পরপর (সিরিজে) রাখতে পারি। তাতে অবশ্য আরেকটি সমস্যা তৈরি হয়।

ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য প্রথমে একটিমাত্র ধারকের কথা চিন্তা করি। ওপরের বাঁয়ের চিত্রে (চিত্র ১) ধারকের ধনাত্মক পাতকে সাদা ও ঋণাত্মক পাতকে কালো দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র রয়েছে, যা ডান দিকমুখী হয়ে আছে এবং পাত দুটোর মধ্যে অবস্থিত ধনাত্মক চার্জের গতিশক্তি সে ক্ষেত্রটি বৃদ্ধি করবে। কারণ, বৈদ্যুতিক বলটি চার্জের বেগ বাড়িয়ে দেবে। এখন আমাদের মনে হতে পারে, এ রকম কয়েকটি ধারক পরপর সাজিয়ে রাখলে আমরা এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে চার্জের গতিশক্তি ইচ্ছেমতো বাড়িয়ে নিতে পারি। কিন্তু এটা বলা সহজ হলেও কাজটা করা এত সোজা নয়। কারণটা কী? সেটা বোঝানোর জন্য পরপর কয়েকটি পাত ধারক সমান্তরালভাবে সাজিয়ে রাখি (চিত্র ২)। আগের মতোই ঋণাত্মক পাতকে সাদা আর ধনাত্মক পাতকে কালো রং দিয়ে বোঝানো হয়েছে। আগের মতোই বাঁ থেকে চলমান ধনাত্মক চার্জ প্রথম সাদা পাত (১) থেকে কালো পাতের (২) দিকে চলমান থাকার সময় চার্জের গতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু পরে, সাদা পাতের (৩) দিকে যাওয়ার সময় যে বৈদ্যুতিক বল উল্টো দিকে কাজ করবে আর তার ফলাফলে গতিশক্তি না বেড়ে বরং কমতে থাকবে, এই সমস্যার সমাধান কী? এটার সমাধান বেশ কয়েকভাবে বিজ্ঞানীরা করলেন। কিন্তু যেটা সব কটা সমাধানই প্রয়োজন হলো, তা হলো একমুখী বিদ্যুৎ বা বিভব পার্থক্য ব্যবহার না করে পরিবর্তিত (Alternating) বিদ্যুৎ বা বিভব পার্থক্য ব্যবহার করা। এখনকার আধুনিক কণাত্বরকগুলোতে (Particle accelerator) এ নীতিই ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ ব্যাপারে পরবর্তী পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করব।

(চলবে)

লেখক : অধ্যাপক, ফিজিক্যাল সায়েন্সেস বিভাগ, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

* আগের পর্ব পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

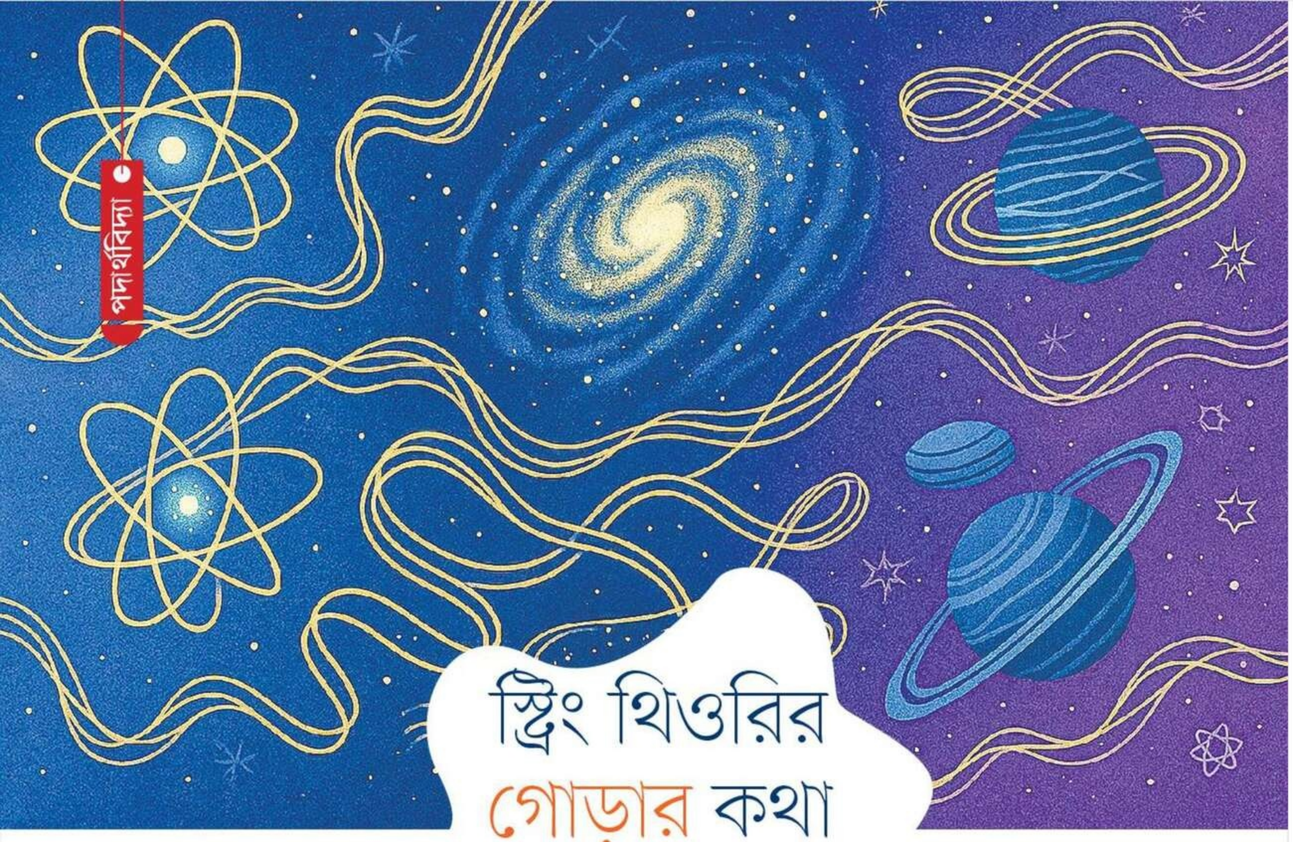

স্ট্রিং থিওরির গোড়ার কথা

আবদুল গাফফার

যুদ্ধ যেমন মানবতাধ্বংসী ইতিহাস তৈরি করে, তেমনি মাঝেমধ্যে বিজ্ঞান গবেষণায় প্রাণসঞ্চারী হয়ে ওঠে। এমনটা দেখা গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগমুহূর্তে। ইউরোপজুড়ে হিটলারের তাণ্ডব। এরই মধ্যে খবর রটেছে, হিটলার নিউক্লিয়ার বোমা তৈরির খুব কাছে পৌঁছে গেছেন। সেই বোমারু দলের নেতৃত্বে রয়েছেন ওয়ার্নার হাইজেনবার্গের মতো বিজ্ঞানীরা। তখন মার্কিন সরকার চিন্তিত হয়ে পড়ে, ওপেনহাইমারের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানীকে জড়ো করে ম্যানহাটান প্রজেক্টে। যেভাবেই হোক, জার্মানির আগে বানাতে হবে নিউক্লিয়ার বোমা। এ জন্য দরকার নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানে প্রাণ সঞ্চার করা। সুতরাং মার্কিন সরকার মহাকাশ বা জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে বরাদ্দ কমিয়ে বেশির ভাগ অর্থই দেদার ঢালতে শুরু করে কণাপদার্থবিজ্ঞানে। কণাপদার্থবিজ্ঞান বলুন বা নিউক্লিয় পদার্থবিজ্ঞান, যুগান্তকারী সব আবিষ্কার হয়েছে ওই সময়েই। এর রেশ ছিল যুদ্ধের পরের দশকগুলোয়ও।

গত শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকজুড়ে বিজ্ঞানীরা ক্লাউড চেম্বার আর ছোট ছোট সাইক্লোট্রনের সাহায্যে আবিষ্কার করেছেন নানা ধরনের ছোট-বড় কণা। বিশেষ করে মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে আসা হ্যাড্রন গোত্রের কণাগুলো। ইউরোপ-আমেরিকার বিজ্ঞানীরা দেদার সেসব কণা আবিষ্কার করছেন, আর বগলদাবা করছেন নোবেল প্রাইজ। এত কণা, এত এত নোবেল দেখে নোবেলজয়ী মার্কিন পদার্থবিদ উইলিস ল্যাম্ব বিরক্তি অথবা কৌতুকের সুরে বলেছিলেন, 'এখন থেকে যিনি নতুন কণা আবিষ্কার করবেন, তাঁকে নোবেল না দিয়ে ১০ হাজার ডলার জরিমানা করা উচিত।' ল্যাম্ব যা-ই বলুন, সে সময় অতশত কণা আবিষ্কৃত হয়েছিল বলেই আজ পার্টিকেল ফিজিকসের ভান্ডার এত সমৃদ্ধ। কণাদের তৈরি রেখাচিত্র ও গণিতের সাহায্যেই একদিন খুলে গিয়েছিল স্ট্রিং তত্ত্বের পথ।

২.

১৯৬৮ সাল। সার্নের তরুণ গবেষক গ্যাব্রিয়েল ভেনেজিয়ানোর হাতে তখন এক গাদা তথ্য-উপাত্ত। এগুলো এসেছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। বিশ্বজুড়ে তখন চলছে ভারী কণাদের ভাঙনের খেলা। সাইক্লোট্রনে, অ্যাটম স্ম্যাশারে এসব কণাদের ভাঙা হচ্ছে। সাইক্লোট্রনে প্রোটন বা নিউট্রনের মতো ভারী কণাদের বৃত্তাকার পথে ঘোরানো হয়। বহুদূর ঘুরিয়ে এদের বেগ বাড়ানো হয় প্রতিনিয়ত। কণারা ত্বরিত হয়। তাই এই যন্ত্রকে বলা হয় কণাত্বরক যন্ত্র, ইংরেজিতে পার্টিকেল অ্যাকসিলারেটর। কণারা বিপুল বেগে ঘুরতে থাকে এবং প্রতি চক্রে এর বেগ বেড়ে যায়।

এমন একটা সময় আসে, যখন আলোর বেগের অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছে যায় কণারা। আর তখনই দেখা যায় নিউটনের ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রের কারিশমা। এই সূত্র বলে, বেগ বৃদ্ধি করলে বস্তুর ভরবেগ বেড়ে যায় উল্লেখযোগ্য হারে। সমানুপাতে বাড়ে তার থেকে পাওয়া বলের মানও। তাই একটা কণা যত ছোটই হোক, তার বেগ যখন আলোর বেগের কাছাকাছি চলে যায়, তখন ভরবেগ যেমন বিপুল হয়, তেমনি গতিশক্তির মানও চরমে ওঠে। সুতরাং সেই সামান্য কণাটিও যখন অন্য বস্তুকে আঘাত করে, সেটা মারাত্মক শক্তিধর হয়ে ওঠে। সাইক্লোট্রনের কণাগুলোয়ও তখন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে পৌঁছে যাওয়া কণাগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটানো হয়, সেই সংঘর্ষে টুকরা টুকরা হয় কণাগুলো। জন্ম হয় তুলনামূলক হালকা কণাদের, সঙ্গে উৎপন্ন হয় বিপুল পরিমাণ শক্তি। এই শক্তি ব্যবহার করে আরও ভারী কণাদের হদিস মেলে।

যুক্তরাষ্ট্রের ফার্মিল্যাবের সাইক্লোট্রন তখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় কণাত্বরক যন্ত্র। এ ছাড়া সার্নেও কিছু ভালো ত্বরক যন্ত্র ছিল। কিন্তু যন্ত্র যেখানেই থাকুক, যেখানেই কণাদের ভাঙা হোক, বিশ্বের আরেক প্রান্তের বিজ্ঞানীদের কাছে পৌঁছে যায় সেই গবেষণার ফলাফল। ভেনেজিয়ানোর হাতে ছিল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কণাদের ভাঙনের ফলাফল। সেগুলোর ছবিও হয়তো ছিল। কিন্তু খাঁটি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানীর কাছে ছবির চেয়ে গণিত কিংবা গ্রাফচিত্রের মূল্য বেশি। ভারী কণাদের ভাঙনের ফলে নতুন যেসব কণার জন্ম হয়, তাদের একটার গতিপথ আরেকটার সঙ্গে মেলে না। তাই এদের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি।

গতিপথের ডেটাগুলো নিয়ে ভেনেজিয়ানো কাজ করছিলেন। ডেটাগুলোর মধ্যে কোনো মিল আছে কি না, সেটাও খুঁজছিলেন। যখন মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তখন তিনি গণিতের বিভিন্ন ফাংশনে ফেলে এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য খোঁজেন। শেষে আলোর রেখা পেলেন। দেখলেন, কণাদের গতিপথের ডেটাগুলো অয়লারের বেটা ফাংশনে ফেললে এদের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তার মানে, সাইক্লোট্রনে যে অজস্র কণার দেখা মিলছিল, আপাতদৃষ্টে তাদের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য ছিল না বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন। কিন্তু ভেনেজিয়ানো দেখলেন, কিছুটা হলেও সম্পর্ক আছে। এই আবিষ্কার বৈপ্লবিক। আপাতদৃষ্টে এলোমেলো কিছু রেখাচিত্র, তার ভেতর গাণিতিক নকশা খুঁজে পাওয়া, এটাই আধুনিক স্ট্রিং তত্ত্বের প্রথম আলোটা দেখিয়ে দেয়। তবে ভেনেজিয়ানো এ নিয়ে বেশি এগোতে পারেননি। একটা প্রবন্ধ ছাপিয়েছিলেন জার্নালে।

কাছাকাছি সময়ে নিউক্লিয়ার ফিজিকস নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করছিলেন তিন মার্কিন বিজ্ঞানী—লিওনার্ড সাসকিন্ড, ডেনিশ-আমেরিকান বিজ্ঞানী হলজার নিয়েলসন ও জাপানি-আমেরিকান বিজ্ঞানী ইউচিরো নাম্বু। নিউক্লিয়ার ফিজিকস নিয়ে কাজ করার বিস্তর সুযোগ তাঁদের। সুতরাং বিশ্বের নানা প্রান্তের গবেষণাগুলোর ফলাফলও তাঁদের হাতে সহজেই এসে যেত। এসেছিল ভেনেজিয়ানোর লেখা প্রবন্ধটিও।

ভেনেজিয়ানোর কাজটা বৈপ্লবিক ও আনকোরা। ইতিহাস বলে, কোনো বৈপ্লবিক তত্ত্বই এত সহজে প্রতিষ্ঠা পায় না। ভেনেজিয়ানোর বেটা ফাংশন তত্ত্ব তাই আমলে নেয়নি বিজ্ঞানী-সমাজ। কিন্তু সবাই তো এক পথে চলেন না। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বেশির ভাগ বৈপ্লবিক তত্ত্ব অনেক বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হলেও কিছু তরুণ প্রাণ সেটাকে বরণ করে নেয়। গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে তৈরি করে নতুন ইতিহাস। যেমনটা দেখা গিয়েছিল কোয়ান্টাম তত্ত্বের ক্ষেত্রে। অন্যরা পাত্তা না দিলেও তরুণ আইনস্টাইন সেটা ব্যবহার করেই আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার সমাধান বের করে ফেলেন। তেমনি চন্দ্রশেখর লিমিটকে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন ছুড়ে ফেলে দিলেও তরুণ বিজ্ঞানী উইলিয়াম ফাউলার সেটাকে লুফে নিয়েছিলেন। অনেক পরে এর জন্য তিনি বগলদাবা করতে সক্ষম হয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার। তেমনি ভেনেজিয়ানোর কাজটাকেও তিন মার্কিন বিজ্ঞানী গুরুত্বের সঙ্গে নেন, তা নিয়ে চলে কাটাছেঁড়া। খুব সহজেই তাঁরা বের করেন ভেনেজিয়ানোর তত্ত্বের ত্রুটিবিচ্যুতি।

তিন মার্কিন বিজ্ঞানী জানতেন, বেটা ফাংশন আসলে একধরনের তরঙ্গ সমীকরণ। সেই তরঙ্গ তৈরি হয় দড়ি বা সুতার মতো বস্তু থেকে। সাসকিন্ড, নিয়েলসন আর নাম্বুরা তাই ভেনেজিয়ানোর সমাধানটা কণাদের ক্ষেত্রে বিবেচনা না করে একমাত্রিক সুতার ক্ষেত্রে যাচাই করে দেখলেন। অর্থাৎ কণাদের কণা হিসেবে না দেখে স্ট্রিং সুতা হিসেবে বিচার করে সেগুলোর হিসাব করলেন। সেই হিসাব থেকেই সবল নিউক্লীয় বলের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হলো।

তিন মার্কিন বিজ্ঞানী হিসাব করে দেখেন, কণার বদলে সেগুলোকে তন্তু বা খুব চিকন একমাত্রিক সুতা হিসেবে দেখা হলে অয়লারের বেটা ফাংশনটি আরও সুন্দরভাবে মানিয়ে যায়। ভেনেজিয়ানো দুটি কণার সংঘর্ষের হিসাব কষেছিলেন। সেখান থেকে পেয়েছিলেন চার কণার স্ক্যাটারিং বা বিক্ষেপণ। কিন্তু কণা চারটি কেন?

ধরা যাক, দুটি গতিশীল কণা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো, তারপর তারা ছুটে গেল দুই দিকে। ব্যাপারটা স্রেফ এমন হলে দুটি কণাই হতো। কিন্তু এ ধরনের ঘটনায় সংঘর্ষের ফলে ভেঙে যায় কণাগুলো। ভরের হেরফের যেমন ঘটে, তেমনি পার্থক্য তৈরি হয় এদের ধর্মে ও বৈশিষ্ট্যে। অর্থাৎ সংঘর্ষের ফলে কণা দুটি ভেঙে দুটি নতুন কণার জন্ম দেয়। তাই পুরো বিক্ষেপণের প্রক্রিয়ায় মোট চারটি কণা জড়িত। এ ধরনের বিক্ষেপণকে বলে চার কণার বিক্ষেপণ।

সাসকিন্ড, নিয়েলসন আর নাম্বু ব্যাপারটাকে একটু অন্যভাবে বোঝার চেষ্টা করলেন। তারপর অঙ্ক মিলিয়ে দেখলেন, কণাগুলোকে ঠিক কণা না ভেবে তন্তু হিসেবে দেখা হলে অয়লারের বেটা ফাংশনের সঙ্গে আরও ভালোভাবে খাপ খেয়ে যায় ভেনেজিয়ানোর তত্ত্ব। কিন্তু তন্তু বা সুতাকে কেন একমাত্রিকই হতে হবে?

কারণ, কণাদের বৈশিষ্ট্য। অতি পারমাণবিক কণাদের বলা হয় একমাত্রিক বিন্দুকণা। যাদের আসলে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ কিংবা উচ্চতা থাকে না। শুধু স্থানের একটা বিন্দুতে অবস্থান করে মাত্র। তাই ভেনেজিয়ানোর তত্ত্বে কণার বদলে স্ট্রিং বা সুতা ধরতে হলে সেটা একমাত্রিক ছাড়া অন্য কোনো আকারের ধরে নিলে হিসাব মেলানো যেত না।

ভেনেজিয়ানোর তত্ত্বে বিজ্ঞানের নতুন জগতের আলো দেখা যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু প্রচলিত তত্ত্বের বাইরে গেলে বিজ্ঞানী-সমাজে সহজে কদর পাওয়া যায় না। সাসকিন্ডরাও পাননি। সুতরাং হালে পানি পায়নি তাঁদের স্ট্রিং তত্ত্ব। তাঁরা একটা পেপার লিখেছিলেন। সেটা পাঠিয়েছিলেন একটা জার্নালে। তা জার্নালের সম্পাদক ছাপেননি। তাই বেশ কয়েক বছর চাপা পড়ে যায় স্ট্রিং তত্ত্ব। কিন্তু এই তত্ত্ব থেকে একটা আভাস পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদের বহু আরাধ্য থিওরি অব এভরিথিং বা সবকিছুর তত্ত্ব লুকিয়ে আছে এর মধ্যে। এটা নিয়েই একসময় আইনস্টাইনও মরিয়া ছিলেন।

৩.

ভেনেজিয়ানো সবল নিউক্লীয় বলগুলো নিয়ে কাজ করতে গিয়েই অয়লারের বেটা ফাংশনের সঙ্গে কণাদের গতিপথের সন্ধান পেয়েছিলেন। বেটা ফাংশন যেহেতু সুতাজাতীয় বস্তুর কম্পন ও গতীয় বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা দিতে পারে, তাই নিউক্লিয়াসের ভেতরে নিউট্রন ও প্রোটন যে নিউক্লিয়ার বল দিয়ে যুক্ত থাকে, সেই সবল নিউক্লীয় বলের সঙ্গে নিশ্চয়ই সুতা বা তন্তুর কোনো সম্পর্ক আছে?

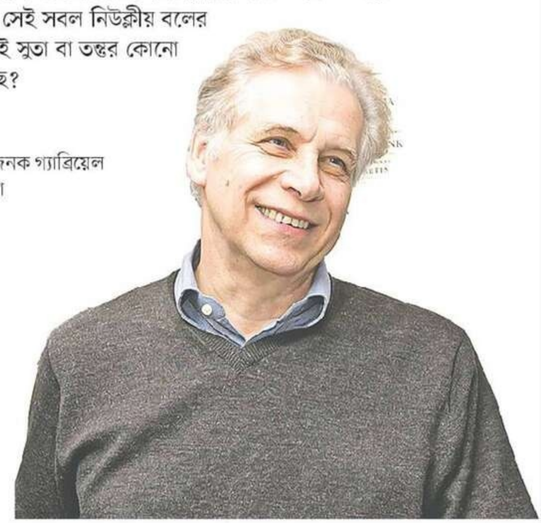

স্ট্রিং তত্ত্বের জনক গ্যাব্রিয়েল ভেনেজিয়ানো

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

এই সম্পর্কটাই খুঁজছিলেন সাসকিন্ডরা। শেষমেশ তাঁরা পেয়েও যান। সাসকিন্ড, নিয়েলসন আর নাম্বুরা সবল নিউক্লীয় বলের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেন এই তত্ত্বের সাহায্যে।

নিউট্রন ও প্রোটন যে মৌলিক কণা নয়, তা জানা গিয়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু সেগুলো কী দিয়ে তৈরি, তা নিয়ে দোলাচল ছিল। ১৯৬৪ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী মারে গেল-ম্যান প্রস্তাব করেন আরেক ক্ষুদ্র কণার তত্ত্ব। তিনি সেই কণাদের নাম দেন কোয়ার্ক। মোট ছয়টি ফ্লেভারের আছে। ফ্লেভার মানে এখানে গন্ধ নয়, কোয়ার্ক কণাদের ধরন। প্রতিটি ফ্লেভারের আবার চারটি কালার আছে। সেই কালারগুলোও আসলে সত্যিকারের রং নয়। এগুলোও কোয়ার্কদের একেকটি ধরন।

নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে সক্রিয় সবল নিউক্লীয় কাজ করে মেসনের মাধ্যমে। মেসন এখানে বলবাহী কণা। কিন্তু নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে থাকা কোয়ার্কগুলো পরস্পরের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত থাকে, তার সমাধানও দিয়েছিলেন গেল-ম্যান। তিনি বলেন, 'কোয়ার্কগুলো পরস্পরের মধ্যে গ্লুয়ন কণা বিনিময় করে।' এর আগে মেসনকেই শুধু সবল নিউক্লীয় বলের বাহক কণা মনে করা হতো। কোয়ার্কের ধারণা পোক্ত হওয়ার পর গ্লুয়নই হয়ে ওঠে সবল নিউক্লীয় বলের মূল বাহক কণা। এরপর কিন্তু সাসকিন্ড, নিয়েলসন আর নাম্বুদের কাজ বেড়ে যায়। মেসন ইন্টারঅ্যাকশনের ব্যাপারটা যত সহজে ব্যাখ্যা করা গিয়েছিল, তাঁরা ভেবেছিলেন কোয়ার্ক গ্লুয়ন ইন্টারঅ্যাকশনও স্ট্রিং তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। সুতরাং কোয়ার্ক-গ্লুয়ন তত্ত্বে গিয়ে ধাক্কা খায় স্ট্রিং তত্ত্ব। অন্যদিকে মেরেকেটে বেরিয়ে যায় কণাপদার্থবিজ্ঞানের স্ট্যান্ডার্ড মডেল। আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায়, কোয়ান্টাম ক্রোমোডায়নামিকসের কাছে পরাজিত হয় স্ট্রিং তত্ত্ব। এরপর বেশ কয়েক বছর ধরে জন শোয়ার্জ নামের আরেক মার্কিন বিজ্ঞানী বাঁচিয়ে তোলেন স্ট্রিং তত্ত্বকে।

৪.

স্ট্রিং তত্ত্ব কী? এখন পর্যন্ত মহাবিশ্বে মূল কণার সংখ্যা হলো মোট ১৬। এর মধ্যে সব ধরনের কোয়ার্ক, ইলেকট্রনসহ ১২টিকে বলে ফার্মিয়ন শ্রেণির কণা। আলোর ফোটন কণাসহ অন্য চারটিকে বলে বোসন শ্রেণির কণা। কিন্তু স্ট্রিং তত্ত্ব অনুযায়ী, এই ১৬টি কণাই শেষ কথা নয়। বস্তুর আরও ক্ষুদ্রতম কণার অস্তিত্ব রয়েছে। সেটা হলো স্ট্রিং বা তন্তু। স্ট্রিংয়ের ঘূর্ণনেই কণার সৃষ্টি।

ধরা যাক ইলেকট্রন বা কোয়ার্কের কথা। এগুলোকে যদি খুব সূক্ষ্মভাবে দেখা যেত, তাহলে দেখতাম এগুলো কণা নয়, সুতার মতো অতি সূক্ষ্ম তন্তুর কম্পন। ধরি একটা চিকন চুড়ির কথা। চুড়িকে ঘুরিয়ে মেঝের ওপর ছড়িয়ে দিলে তখন আর সেটাকে চুড়ির মতো দেখায় না। দেখায় টেনিস বল আকারে একটা গোলকের মতো। আবার চুড়ির ঘূর্ণন যখন থেমে যাবে, তখন চুড়িকে আর বলের মতো দেখাবে না। সুতার বিভিন্ন মাত্রায় কম্পনের ফলে বিভিন্ন কণার সৃষ্টি। যেমন ইলেকট্রনের জন্য তন্তুর কম্পনের মাত্রা এক রকম। কোয়ার্কের জন্য তন্তুর কম্পনের মাত্রা আবার ভিন্ন। অন্য মৌলিক কণাদের জন্য তন্তুর আলাদা মাত্রার কম্পন নির্দিষ্ট আছে। তন্তুর কম্পনের মাত্রাই ঠিক করে দেয়, তা থেকে সৃষ্ট কণার ভর, চার্জ ও স্পিন কেমন হবে। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলোই এক ধরনের কণা থেকে আরেক ধরনের কণার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। আর এসব বিচিত্র কণা দিয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের মহাবিশ্ব। এই মহাবিশ্ব তাই সুতায় বোনা মহাবিশ্ব।

লেখক : সাংবাদিক

সূত্র : ১. *দ্য ট্রাবল উইথ ফিজিকস/লি স্মলিন*
২. *হোয়াই স্ট্রিং থিওরি/জেসেফ কনলন*
৩. *দ্য ফেব্রিক অব কসমস/ব্রায়ান গ্রিন*
৪. *দ্য গড ইকুয়েশন/মিচিও কাকু/অনুবাদ : আবুল বাসার*

গণিতের সমস্যা ১০১

শ্রেণি অনুসারে নিচের গণিতের সমস্যার সমাধান করে আমাদের কাছে পাঠান। সঠিক সমাধানদাতা তিনজন পাবেন রকমারি ডটকমের সৌজন্যে ৫০০ টাকার বই। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ মে। খামের ওপর **গণিতের সমস্যা ১০১** লিখুন। নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর স্পষ্ট করে লিখুন।

প্রাইমারি

1 থেকে 100 পর্যন্ত কতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে, যেগুলো 100-এর নিচে থাকা যে কোনো বর্গ সংখ্যার সঙ্গে সহমৌলিক?

জুনিয়র

একটি 9 সদস্যের বেসবল দল তাঁদের খেলার পর আইসক্রিম পারলারে গিয়েছিল। প্রত্যেক খেলোয়াড় একটি সিঙ্গেল-স্কুপ কোন খেয়েছে—চকলেট, ভ্যানিলা অথবা স্ট্রবেরি ফ্লেভার। অন্তত একজন খেলোয়াড় প্রতিটি ফ্লেভার বেছে নিয়েছে এবং চকলেট নেওয়া খেলোয়াড়দের সংখ্যা ভ্যানিলা নেওয়া খেলোয়াড়দের চেয়ে বেশি। এটা আবার স্ট্রবেরি নেওয়া খেলোয়াড়দের চেয়েও বেশি।
ধরা যাক N = এমন কতভাবে ফ্লেভারগুলো খেলোয়াড়দের মধ্যে ভাগ করা যায়, যেগুলো ওপরের শর্তগুলো পূরণ করে। N-কে 1000 দিয়ে ভাগ করলে কত অবশিষ্ট থাকে?

সাধারণ

ধরি, N হলো কতগুলো অর্ডার্ড ট্রিপলেট (Ordered triplet) ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা (a,b,c) (a, b, c) (a,b,c)-এর, যাতে a,b,c ≤ 36 এবং $a^3+b^3+c^3$ হয় 37-এর গুণিতক। N-কে 1000 দিয়ে ভাগ করলে কত অবশিষ্ট থাকে?

গণিতের সমস্যা ১০০-এর বিজয়ী

ইমতিয়াজ আহমেদ, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ
ফাহিম ফিরোজ, মল্লিকহাটি, নাটোর
জাকির হোসেন, মিরপুর, ঢাকা

গ্রন্থনা : **নাফিস তিহাম**, একাডেমিক সমন্বয়ক
বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

বিজ্ঞানায়োজন

শুরু হচ্ছে জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড

শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড। ১৬ মে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হবে এ অলিম্পিয়াড। চলতি বছর মোট ১০টি অঞ্চলে এ অলিম্পিয়াড আয়োজিত হবে।

অলিম্পিয়াডের সময়সূচি

১৬ মে ২০২৫ : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা দক্ষিণ
১৬ মে ২০২৫ : হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি.প্র.বি, দিনাজপুর, রংপুর
১৭ মে ২০২৫ : খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা
১৭ মে ২০২৫ : শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা উত্তর
২৩ মে ২০২৫ : বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল
২৩ মে ২০২৫ : সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া
২৩ মে ২০২৫ : সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
২৪ মে ২০২৫ : সাইডার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, চট্টগ্রাম
২৪ মে ২০২৫ : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
২৪ মে ২০২৫ : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

চিলড্রেন রিসার্চ ফান্ড পেল ৯ শিক্ষার্থী

চিলড্রেন রিসার্চ ফান্ড পেল ৯ শিক্ষার্থী। ২৫ এপ্রিল, শুক্রবার বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতির কার্যালয়ে শিক্ষার্থীদের গবেষণার জন্য এ অনুদান ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণ তুলে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার খুদে গবেষকেরা এ জন্য কনসেপ্ট পেপার বা ধারণাপত্র জমা দেয়। এর মধ্য থেকে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মোট ৯ শিক্ষার্থী এ ফান্ডের জন্য মনোনীত হয়েছে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা হলো নটর ডেম কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী শুভাশিস হালদার, চট্টগ্রামের গভর্নমেন্ট সিটি কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মৃত্তিকা দে ও স্বস্তিকা দে, মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী আলী আহসান, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মুয়াম্মার দাইয়ান ও মুহাইমেনুল ইসলাম, একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী নাহিয়ান পারিন, ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী রুদাইবা তারান্নুম ও নুসাইবা তাজরীন।

জিতেন্দ্র বড়ুয়া | মো. রায়হান সিদ্দিকী | আওয়াল হুমীম চৌধুরী | মনামী জামান | তাহসিন খান | এম জামিউল হোসেন

আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে যাচ্ছে ছয় শিক্ষার্থী

৬৬তম আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের (আইএমও) দল ঘোষণা করা হয়েছে। ৬ সদস্যের এ দলের সঙ্গে থাকবেন একজন কোচ ও একজন উপদলনেতা। আইএমওর ৬৬তম আসর অনুষ্ঠিত হবে অস্ট্রেলিয়ার সানশাইন কোস্ট শহরে। চলতি বছরের ১০-২০ জুলাই বসবে এ আসর।

এ ছয় সদস্য হলো ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের এসএসসি পরীক্ষার্থী মনামী জামান, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের এসএসসি পরীক্ষার্থী জাওয়াদ হামীম চৌধুরী, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী এম জামিউল হোসেন, চট্টগ্রাম বাকলিয়া সরকারি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী জিতেন্দ্র বড়ুয়া, চট্টগ্রাম কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. রায়হান সিদ্দিকী এবং ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থী তাহসিন খান।

এ ছাড়া এ দলের সঙ্গে কোচ হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড দলের কোচ মাহবুব মজুমদার এবং উপদলনেতা হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান।

আদিত্য রহমান | মোঃ ফাইয়াজ সিদ্দিকী | ফাহিম ফারবিন | নাফিস সাদিক | সিএম রাফাত হাসনাইন

আন্তর্জাতিক ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের দল ঘোষণা

৫৫তম আন্তর্জাতিক ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের জন্য পাঁচ সদস্যের বাংলাদেশ দল ঘোষণা করা হয়েছে। ফ্রান্সের প্যারিসে এবারের আসর অনুষ্ঠিত হবে ১৭ থেকে ২৫ জুলাই।

এ দলের সদস্যরা হলো সেন্ট যোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী আদিত্য রহমান, গ্লেনরিচ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থী মো. ফাইয়াজ সিদ্দিকী, নটর ডেম কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ফাহিম ফারবিন, রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের এসএসসি পরীক্ষার্থী নাফিস সাদিক এবং নটর ডেম কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী সিএম রাফাত হাসনাইন।

দলের সঙ্গে কোচ হিসেবে থাকবেন ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিক্যাল সায়েন্সেসের অধ্যাপক আরশাদ মোমেন। দলনেতা হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর মাসুদ।

টেলিস্কোপে আকাশ দেখল কয়েক শ মানুষ

টেলিস্কোপে চাঁদ ও বৃহস্পতি গ্রহ দেখলেন কয়েক শ মানুষ। গত ৩ এপ্রিল, শনিবার রাজধানীর বাংলামোটরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ছাদে নানা বয়স ও শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে অংশ নেন। বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের এ আয়োজন চলে সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত। প্রতি মাসে দ্বিতীয় শনিবার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ছাদ থেকে বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আকাশ দেখার আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনের সহযোগিতায় ছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ও *প্রথম আলো*।

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

পদার্থবিদ্যা

প্ল্যাঙ্ক স্কেলের রহস্য

যেখানে ভেঙে পড়ে সবকিছু

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

বিগ ব্যাংয়ের পরপর... শিশু মহাবিশ্বে, যেখানে ভেঙে পড়ে আমাদের জানা সব সূত্র, সব নিয়মকানুন, সবকিছু... সেই প্ল্যাঙ্ক স্কেলের রহস্য...

যদি বলি, বিগ ব্যাংয়ের পরপর ঠিক কী হয়েছে, সে সবই আমরা শুধু তত্ত্বীয়ভাবে জানি, বিশ্বাস করবেন? যদি বলি, সেখানে আমাদের তাকানো নিষেধ—এ যেন এক মহাজাগতিক দুর্ভেদ্য দেয়াল; মানতে চাইবেন সে কথা?

প্রশ্নটা আরেকটু স্পষ্টভাবে করি। দূর অতীতে, মহাবিশ্বের সূচনার পরপর—সেই শুরুতে ঠিক কী হয়েছিল? উত্তর : কেউ জানে না।

বিজ্ঞানীরা যখন টেলিস্কোপে চোখ রেখে তাকান, বহু দূরের অতীত দেখতে পান তাঁরা। জেমস ওয়েব নভোদুরবিন খুঁজে চলেছে মহাবিশ্বের প্রথম আলো। বিগ ব্যাংয়ের অবশেষ হিসেবে মহাবিশ্বের প্রথম আলোর ম্লান চিহ্ন বা ছাপ চারপাশে সবখানে দেখতে পাই আমরা। এই ছাপের নাম কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন বা সিএমবি। এই ছাপ, মহাবিশ্বের প্রথম আলো কিংবা আমাদের তত্ত্বীয় দৃষ্টিসীমা—সবকিছু একটা পর্যায়ে গিয়ে থমকে যায়। এ যেন এক রহস্যময় পর্দা, যে পর্দার ওপারে তাকানো নিষেধ।

এই পর্দার ওপারের জগৎটিই প্ল্যাঙ্ক স্কেলের জগৎ, যেখানে একসঙ্গে মিলেমিশে যায় আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। একসঙ্গে একীভূত থাকে মহাবিশ্বের চারটি মৌলিক বল। মহাবিশ্বের সূচনা, কোয়ার্ক-লেপটনের মতো মৌলিক কণা মিলে প্রথম হাইড্রোজেন বা মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি—এই সবকিছু হয়েছে এই পর্দার ওপারে, যা এই বিশ্বের কেউ দেখেনি। কোনো যন্ত্র দিয়ে তা দেখা সম্ভব নয়।

কেন? চলুন, প্ল্যাঙ্ক স্কেলের রহস্যময় জগতে কল্পরথে চড়ে উঁকি দেওয়া যাক।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম বিপ্লব ও প্ল্যাঙ্ক স্কেলের ধারণার সূচনা

১৮৯০-এর দশক। বিজ্ঞান তখন ভরা যৌবনে। পদার্থবিদেরা মনে করতেন, মহাবিশ্বের সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে বললেই চলে। শুধু কিছু 'ছোটখাটো' সমস্যার সমাধান বাকি আছে।

এ রকমই একটি 'ছোটখাটো' সমস্যা ছিল 'ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন'। অর্থাৎ কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ। সমস্যাটা কী? অতি সরলীকরণ করে সংক্ষেপে বলা যায়, উত্তপ্ত বস্তু কীভাবে আলো বিকিরণ করে, সেটা বুঝতে পারছিলেন না বিজ্ঞানীরা। এ সমস্যার সূত্র ধরেই দেখা দেয় 'অতিবেগুনি বিপর্যয়'।

গল্পের পেছনেও গল্প থাকে। তেমনি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের এ গল্পের পেছনে আছে উইলহেম ভিনের ডিসপ্লেসমেন্ট ল, র‍্যালে-জিনসের সূত্রসহ আরও অনেক কিছু। আমরা সেই কাহিনিতে যাব না। শুধু সমস্যাটার কথা সংক্ষেপে বলা যাক।

কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যায় একটা সূত্র প্রণয়ন করেন জার্মান বিজ্ঞানী উইলহেম ভিন। ভিনের সূত্রটি ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মিলে গেল। কিন্তু দেখা গেল যে দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের ব্যাখ্যায় সূত্রটি কাজ করছে না। ভুল ফলাফল দিচ্ছে। এরপর দীর্ঘ তরঙ্গের বিকিরণের ব্যাখ্যায় ব্রিটিশ পদার্থবিদ লর্ড র‍্যালে ও স্যার জেমস জিনস আরেকটি সূত্র দিলেন। এটিই র‍্যালে-জিনসের সূত্র। এই সূত্র বলে, উত্তপ্ত বস্তু থেকে নিঃসৃত বিকিরণের তীব্রতা সরাসরি তার পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক এবং বিকীর্ণ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

এই সূত্র থেকেই সেই অতিবেগুনি বিপর্যয়ের সূচনা। দেখা গেল, যত ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে যাওয়া হচ্ছে, এ সূত্রানুসারে বিকিরণের তীব্রতা তত অসীমের দিকে যেতে থাকে। অর্থাৎ তাত্ত্বিক হিসাব অনুযায়ী, উত্তপ্ত কৃষ্ণবস্তু থেকে একসময় অসীম শক্তি নির্গত হওয়ার কথা। সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়, এটা হতে পারে না। সে ক্ষেত্রে মহাবিশ্ব অনেক আগেই বিশাল এক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হতো।

এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় প্ল্যাঙ্ক ভাবলেন, আলোকে যদি ধারাবাহিক 'রশ্মি' না ভেবে ছোট ছোট খণ্ড বা প্যাকেটের

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

সমষ্টি বলে ভাবা যায়, তাহলে এই সমস্যার সমাধান মেলে। এই ছোট ছোট প্যাকেটকেই তিনি বললেন কোয়ান্টা। এই কোয়ান্টা নির্ধারণের জন্য তিনি একটা নতুন ধ্রুবক নিয়ে এলেন। এটাকেই আজ আমরা বলি প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট বা প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক (**h**)।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক দেখালেন, নির্গত শক্তির হিসাব এভাবে করা যায়, $E = h \times f$। এখানে E হলো শক্তি, **h** প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক আর **f** হলো আলোর কম্পাঙ্ক।

এই ধারণার মাধ্যমে প্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন সমস্যার দারুণ এক সমাধান দিলেন আর ঘটনাচক্রে গোটা বিজ্ঞানের ইতিহাস বদলে গেল। সূচনা হলো কোয়ান্টাম তত্ত্বের।

***

প্ল্যাঙ্ক যখন দেখলেন যে আলো নির্দিষ্ট কোয়ান্টায় নির্গত হয়, তখন তাঁর মনে হলো, মহাবিশ্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোও হয়তো এ রকম কিছু নির্দিষ্ট সীমা বা একক 'প্যাকেট' দিয়ে গড়া। অর্থাৎ এটিই মহাবিশ্বের সর্বনিম্ন সীমা। আজ আমরা একেই বলি প্ল্যাঙ্ক সীমা।

প্ল্যাঙ্ক প্রকৃতির মৌলিক ধ্রুবকগুলো, যেমন আলোর গতি c, মহাকর্ষ ধ্রুবক G, প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক **h** ইত্যাদি সমন্বয় করে বিশেষ একধরনের একক বানাতে চাইলেন। এভাবে তিনি প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য, প্ল্যাঙ্ক সময়, প্ল্যাঙ্ক ভর ও প্ল্যাঙ্ক তাপমাত্রার সন্ধান পান। এই সব কটিই প্রকৃতির মৌলিক ধ্রুবকে গড়া একক, মানবসৃষ্ট একক নয়। প্ল্যাঙ্ক নিজে ভাবেননি যে এর কোনো নিগূঢ় অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও আপেক্ষিকতার হাত ধরে বোঝা গেল যে এগুলোই মহাবিশ্বের সর্বনিম্ন সীমা। প্রাকৃতিক সীমা।

মহাবিশ্বের সূচনার পরপর, মহাবিশ্বের দৈর্ঘ্য যখন ছিল ০ থেকে $১০^{-৩৫}$ মিটারের মধ্যে, ০ থেকে $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ডের মধ্যকার সময়টুকুকে বলা হয় প্ল্যাঙ্ক যুগ।

এখানেই আমাদের জানা পদার্থবিজ্ঞানের মূল কাঠামো ভেঙে পড়ে।

মহাবিশ্বের গঠন-কাঠামো-উপাদান

বিগ ব্যাংয়ের পরপর মহাবিশ্ব দ্রুত বড় হচ্ছিল, প্রসারিত হচ্ছিল। এ সময় মহাবিশ্ব ছিল অত্যন্ত উচ্চ শক্তির, ঘনভাবে মিলেমিশে থাকা আলট্রা-রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টায় ভরপুর। অর্থাৎ শক্তি ও কণা মিলেমিশে একধরনের স্যুপের মতো অবস্থা। ধীরে ধীরে সেখানে মৌলিক কণাগুলো একীভূত হয়ে মৌলিক পদার্থ তৈরি করে। কালের আবর্তে এসব পদার্থই গড়ে তোলে আজকের গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সি বা গ্যালাক্সিপুঞ্জের মতো বড় কাঠামো।

মৌলিক কণাগুলো কেমন? তার একটা ধারণা পাওয়া যায় পদার্থবিজ্ঞানের স্ট্যান্ডার্ড মডেলের দিকে তাকালে (ছবি দেখুন)। এই তালিকায় আছে ১২ ধরনের বস্তুকণা—ছয় ধরনের কোয়ার্ক এবং ছয় ধরনের লেপটন; চার ধরনের বলের কণা ও হিগস বোসন। এই যে কণারা—এগুলো আসলে চারটি মৌলিক বলের মাধ্যমে যুক্ত হয়, মিথস্ক্রিয়া করে এবং বিভিন্ন কাঠামো গড়ে তোলে। মৌলিক বলগুলোর কথা হয়তো জানেন—মহাকর্ষ, তড়িৎচৌম্বক বল এবং শক্তিশালী ও দুর্বল নিউক্লিয়ার বল। স্ট্যান্ডার্ড মডেলে যে বলের কণাগুলো আছে, এগুলো আসলে বলের বাহক কণা। তড়িৎচৌম্বক বলের বাহক ফোটন, গ্লুয়ন কাজ করে শক্তিশালী বলের কণা হিসেবে। আর দুর্বল নিউক্লিয়ার বলের বাহক ডব্লিউ ও জেড বোসন। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মহাকর্ষের একটি কণা রয়েছে—গ্র্যাভিটন। তবে এই কণার আজ পর্যন্ত কোনো প্রমাণ মেলেনি।

বিজ্ঞানীদের সব চেষ্টার মোদ্দাকথা হলো মহাবিশ্বের সূচনাকালে এই চারটি বল যেমন একসঙ্গে ছিল, তত্ত্বের মাধ্যমে এগুলোকে সে রকম একীভূত করা। অর্থাৎ এমন একটি গাণিতিক কাঠামো, যার মাধ্যমে এই চারটি বলকে একটি বলের বিভিন্ন রূপ হিসেবে দেখানো যায়। এ পর্যন্ত শুধু দুর্বল নিউক্লিয়ার বল ও তড়িৎ-চৌম্বক বলকে একীভূত করা গেছে, তাত্ত্বিকভাবে শক্তিশালী বলকেও একীভূত করার উপায় পাওয়া গেছে, তবে মহাকর্ষকে বাকি তিনটি বলের সঙ্গে একীভূত করার কোনো গাণিতিক উপায়ও পাওয়া যায়নি। কেন, সেটা একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

আমরা যেসব বস্তুকে চোখে দেখি বা যেগুলো দিয়ে কিছু করি, বড় পরিসরের সেসব বস্তুর আচরণ ব্যাখ্যা করে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। আবার প্রোটন-নিউট্রনের মতো উপপারমাণবিক কণাদের আচরণ ব্যাখ্যা করে কোয়ান্টাম তত্ত্ব।

আমরা জানি, আলো একই সঙ্গে কণা ও তরঙ্গ। কিন্তু একটা তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কতটা ছোট হলে তার আর কোনো ভৌত বা সত্যিকার অর্থ থাকে না, অর্থাৎ বিষয়টা আর একদমই বোঝার মতো অবস্থায় থাকে না, তার একটা সর্বনিম্ন সীমা আছে। এই সীমাই প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য : প্রায় $১০^{-৩৫}$ মিটার। এই সীমার পরে, অর্থাৎ এর চেয়ে ছোট পরিসরে—আমাদের যদিও কোনো গাণিতিক কাঠামো বা তত্ত্ব নেই, তবু সব হিসাব বলছে যে মহাকর্ষ নিজেই কোয়ান্টাম আচরণ করতে শুরু করে। এ সময় তত্ত্বীয়ভাবে স্থান-কাল আর নিরবচ্ছিন্ন থাকে না। বলা ভালো, থাকার কথা নয়। বরং একধরনের অস্থির, দোলায়মান 'কোয়ান্টাম বিন্দু' বা 'কোয়ান্টাম ফেনা'র মতো আচরণ করে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এ পরিস্থিতি ব্যাখ্যার জন্য নতুন তত্ত্ব প্রয়োজন। মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি। আগেই বলেছি, এমন কোনো তত্ত্ব বা গাণিতিক কাঠামো বিজ্ঞানীরা আজও খুঁজে পাননি।

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

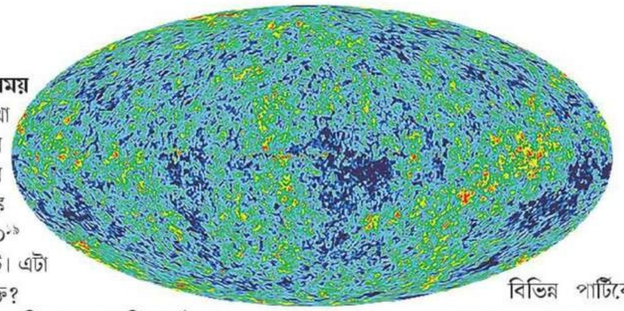

এই সেই মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ

প্ল্যাঙ্ক শক্তি ও প্ল্যাঙ্ক সময়

প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যের কথা তো বললাম, এবারে প্ল্যাঙ্ক শক্তি ও সময়ের কথা বলা যাক। প্ল্যাঙ্ক শক্তির মান প্রায় $১০^{১৯}$ গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট। এটা আসলে কত উচ্চ শক্তি?

মহাবিশ্বের বিভিন্ন দিকে, এমনকি সূর্য থেকেই একধরনের অত্যুচ্চ শক্তির কণা পৃথিবীর ওপর হামলা করে। হয়তো জানেন, এগুলোকে বলা হয় মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রে। এর শক্তির মান $১০^{১১}$ গিগা ইলেকট্রন ভোল্টের সমান।

আর প্ল্যাঙ্ক সময়? $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড। এই অতি ক্ষুদ্র সময়ের গুরুত্ব কী?

কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলে, বস্তু যখন অনেক ছোট হয়, যেমন উপপারমাণবিক কণারা, তখন এগুলোর ভরবেগ ও অবস্থানের মধ্যে একধরনের 'অনিশ্চয়তামূলক' সম্পর্ক দেখা যায়। সহজ করে বললে, এগুলোর ভরবেগ জানলে অবস্থান নিশ্চিত করে জানা যায় না। আবার অবস্থান নিশ্চিতভাবে জানলে ভরবেগ নিশ্চিত করে জানা যায় না। এ-ই হলো আমাদের জানাশোনার ক্ষুদ্র পরিসরের অবস্থা। কিন্তু প্ল্যাঙ্ক সময়ের চেয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে সাধারণ শক্তি তথা এনার্জি ফ্ল্যাকচুয়েশনই একটা কৃষ্ণগহ্বর তৈরি করতে পারে।

কৃষ্ণগহ্বর যে বাস্তব, তা আমরা জানি। এর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ এত প্রবল যে গহ্বরের বাইরের সীমানা—ইভেন্ট হরাইজন তথা ঘটনাদিগন্ত পেরিয়ে কোনো কিছুই বের হতে পারে না। এমনকি আলোও পেরোতে পারে না। ২০১৯ সালের ১০ এপ্রিল ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো তোলা কৃষ্ণগহ্বরের ছবি প্রকাশ করেছেন।

যাহোক, তত্ত্বীয় হিসাব বলছে যে প্ল্যাঙ্ক সময়ের চেয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হয়ে স্থির থাকতে পারবে না। হকিং বিকিরণের মাধ্যমে সেই কৃষ্ণগহ্বর ক্ষয়ে যাবে। কৃষ্ণগহ্বরের ভর যত কম হবে, তা ক্ষয়ে যাবে তত দ্রুত। 'কোয়ান্টাম ফেনা'র মতো অস্থির সেই মহাবিশ্ব অনিশ্চয়তাময়।

আমরা জানি, স্থান ও কাল আলাদা কিছু নয়। বরং মহাবিশ্বটা হলো স্থান-কালের সমষ্টিগত একটি রূপ। আপেক্ষিকতা তত্ত্বে আলবার্ট আইনস্টাইন এটা দেখিয়েছেন। মহাবিশ্বের সূচনাকালে, যখন স্থান ছিল প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট, সময় ছিল প্ল্যাঙ্ক সময়ের চেয়ে কম, সেই সময়ের অনিশ্চিত কোয়ান্টাম-মহাকর্ষীয় মহাবিশ্বে ঠিক কী হয়েছিল?

যত দিন মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব পাওয়া না যাচ্ছে, তত দিন এর কোনো সত্যিকারের উত্তর আমরা পাব না।

পর্দার ওপারে

কিছুদিন আগে জেমস ওয়েব নভোদূরবিন আমাদের জানা সবচেয়ে প্রাচীন গ্যালাক্সির ছবি তুলেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে JADES-GS-z14-0। আমরা যদি আরও দূরে তাকাই, আরও আরও দূরে, তাহলে একসময় আমাদের দৃষ্টি মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণে গিয়ে থামবে। তার ওপাশে শুধু আলো আর আলো, নানা রকম বিকিরণ। মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ যেন বিশাল কোনো পর্দায় ঢেকে দিয়েছে মহাবিশ্বের অতীতের সবটা। এই পর্দার ওপাশে আমাদের তাকানো নিষেধ। কোনো যন্ত্র দিয়ে তা দেখা সম্ভব নয়।

তাহলে বিজ্ঞানীরা কীভাবে জানলেন যে কী হয়েছে পর্দার ওপারে? সহজ করে বললে, সার্নের মতো গবেষণাগারগুলোয় বিভিন্ন পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর বা কণাত্বরক যন্ত্রে এগুলো পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তা ছাড়া এই পর্দার ওপাশ থেকে কিছু নিউট্রিনো কণা ছুটে আসে। সেগুলো থেকেও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তবে বলা বাহুল্য, গাণিতিক যুক্তি ও গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখে তার সঙ্গে প্রকৃতির আচরণ মিলিয়ে নিয়েই বিজ্ঞানীরা জেনেছেন মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের ওপারের কথা।

কিন্তু গবেষণাগারে কতটা অতীতে যাওয়া যায়? আমরা যদি সময়ের উল্টো দিকে চলতে শুরু করি, ধরুন এটা একটা মহাজাগতিক ভিডিও, উল্টো করে চালিয়ে দিলাম, বর্তমান থেকে ধীরে ধীরে ওটা বিগ ব্যাংয়ে গিয়ে শেষ হবে; মহাজাগতিক এই ভিডিওকে উল্টো করে চালিয়ে কত দূর পর্যন্ত যেতে পারি আমরা? $১০^{-১২}$ সেকেন্ড পর্যন্ত। এর আগের মহাবিশ্বে কী হয়েছে, তা আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি না। কাজেই এর আগের সবকিছুই আসলে তাত্ত্বিক। বলা ভালো, হাইপোথেটিক্যাল। সম্ভাবনা।

এ রকম একটি সম্ভাবনা হলো, $১০^{-৩৬}$ সেকেন্ড থেকে $১০^{-৩২}$ সেকেন্ড পর্যন্ত মহাবিশ্ব হঠাৎ অনেক দ্রুত অনেকখানি প্রসারিত হয়ে গেছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির মতো মহাবিশ্বের এই প্রসারণও হয়েছে আচমকা। এই বেড়ে ওঠাকে বলা হয় ইনফ্লেশন। সত্যিই কি এমন কিছু হয়েছে? আমরা নিশ্চিত নই।

কারণ, আরও আগেই, $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ডে মহাজাগতিক উল্টো ভিডিওটি প্রবেশ করেছে প্ল্যাঙ্ক যুগে। যেমনটা বললাম, এই সময়ে গোটা মহাবিশ্বের সবকিছু এত অকল্পনীয় ক্ষুদ্র দূরত্ব ও ক্ষুদ্র সময়ে অবস্থান করে যে বিপাকেই পড়ে যান বিজ্ঞানীরা।

এই অনিশ্চয়তা ভরা ক্ষুদ্র জায়গাটুকু, যেখানে রয়েছে বিপুল ভর, অসীম ঘনত্ব—এমনই একটি মহাজাগতিক বস্তু রয়েছে আমাদের চিরচেনা। নাম তার ব্ল্যাকহোল—কৃষ্ণগহ্বর। এ রকম অসীম ঘন, বিপুল ভারী, মহাবিশ্বের সব মিলেমিশে যেখানে একাকার হয়ে যায়, যেখানে মিশে থাকে চারটি মৌলিক বল একসঙ্গে। সেখানে এসে ভেঙে পড়ে পদার্থবিদ্যার জানা সব তত্ত্ব। মানে তখন আর পদার্থবিজ্ঞানের কোনো সূত্র বা তত্ত্ব কাজ করে না। এ রকম যেকোনো বিন্দুসম ক্ষুদ্র জায়গাকে বলা হয় সিঙ্গুলারিটি বা পরম বিন্দু।

মহাবিশ্বের শুরুটা তাহলে কেমন করে হয়েছিল? বিগ ব্যাং কি সত্যিই ঘটেছিল? আমরা জানি না। এর বেশ কিছু বিকল্প ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিভিন্ন বিজ্ঞানী। তবে সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গণিতের যুক্তিতে হালে পানি পায়নি সেভাবে। আমরা শুধু জানি যে মহাবিশ্বের একটি সূচনা ছিল। জানি, বিগ ব্যাং এখন পর্যন্ত এর সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ব্যাখ্যা। জানি, এর পরের ঘটনাপ্রবাহকে সত্যিই বুঝতে আমাদের আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম তত্ত্বকে একীভূত করতে হবে, যাকে বলা হয় সবকিছুর তত্ত্ব বা থিওরি অব এভরিথিং। সেদিন হয়তো আমরা প্ল্যাঙ্ক স্কেলের সীমার ওপারে তাকাতে পারব, দেখতে পাব শিশু মহাবিশ্বের সত্যিকার রূপ।

লেখক : সহসম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা
সূত্র : বিগ থিঙ্ক, নাসা, উইকিপিডিয়া
মহাজাগতিক প্রথম আলো! আবুল বাসার
অ্যাস্ট্রোফিজিকস ফর পিপল ইন আ হারি! নীল ডিগ্র্যাস টাইসন

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

বইপত্র

গণিতের রাজ্যে, ভিন্ন এক কল্পবাস্তবতায়

অঙ্ক ও মেজোকাকুর হেঁয়ালি

ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী

প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
প্রথম প্রকাশ : ২০২৪
প্রচ্ছদ : আরাফাত করিম
পৃষ্ঠা : ১১৮
দাম : ৩৫০ টাকা

গাণিতিক ধাঁধার কাছে কি পরাজিত হতে পারে মানুষ? বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে কারও জীবন? এ প্রশ্নের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে অনেক অজানা গল্প, নানা প্রশ্ন ও হেঁয়ালি। খুলেই বলি।

মেজোকাকু আলাভোলা মানুষ। পরিবারে একরকম বহিষ্কৃত। তাঁর কথা বলাও মানা! ধীরে ধীরে পাঠক জানবেন, মেজোকাকু—ড. রহমান আসলে ডাকসাইটে গণিতবিদ। হোমরাচোমরা প্রফেসর। ইতিহাসখ্যাত সুইস গণিতবিদ লিওনার্দ অয়লারের জন্মদিনে তাঁকে আলোচনা সভায় বক্তব্য দিতে ডাকা হয়। তাহলে তাঁকে বাড়ির কেউ সহ্য করতে পারে না কেন?

রহস্যের জট খোলে ধীরে ধীরে। জানা যায়, মেজোকাকু আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন। পিএইচডি শেষ করে জার্মানির বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। তারপর কী এক অদ্ভুত গাণিতিক ধাঁধা নিয়ে পড়েছেন সব ছেড়ে। এই ধাঁধার নাম গোল্ডবাখের কনজেকচার। সহজ বাংলায়, গোল্ডবাখের ধাঁধা।

এর মাধ্যমে আমরা, পাঠক ঢুকে পড়তে থাকি গণিতের আশ্চর্য জগতে। দেখতে পাই, গণিতের দুরূহতম তিন সমস্যার একটির পেছনে মেজোকাকু লেগে আছেন নাওয়া-খাওয়া সব ছেড়ে। কাজ করছেন বিশুদ্ধ গণিত নিয়ে।

গোল্ডবাখের কনজেকচার শুনতে খুব সহজ। এর প্রস্তাব হলো দুইয়ের চেয়ে বড় সব জোড় সংখ্যাকে দুটি মৌলিক সংখ্যার যোগফল হিসেবে দেখানো যায়। এই সেই সোনার হরিণ। গল্পে একে একে ইতিহাসের চরিত্ররা ভিড় জমাতে শুরু করে, এরপর ডেভিড হিলবার্ট, কুর্ট গোডেল থেকে শুরু করে জন লিটলউড, অ্যালান টুরিং মেজোকাকুর সঙ্গে কখনো কথা বলেন, কখনো তাঁদের কাজকারবারে রাগ করেন ড. রহমান। আর বিভোর হয়ে থাকেন সোনার হরিণ ধরার স্বপ্নে। এই স্বপ্ন খুঁজে ফেরার গল্প নিয়েই *অঙ্ক ও মেজোকাকুর হেঁয়ালি*।

এখানে বাস্তব আর কল্পনা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। বাংলাদেশি এ রকম এক গণিতবিদের চরিত্র আমাদের কি জামাল নজরুল ইসলামের কথাও খানিকটা মনে করিয়ে দেয় না? তবে মেজোকাকু একদম ভিন্ন চরিত্র। দেশে বিজ্ঞানচর্চা বা এ রকম কিছু নিয়ে তাঁর আগ্রহ নেই; বরং তিনি বলেন, গণিতে ডুবে যেতে না পারলে সেই চেষ্টাই কোরো না। এ কথা বলে ঠিক বিপরীতধর্মী কথার ইঙ্গিতে আরও উসকে দেন আগ্রহ। তাঁর স্বপ্নে ধরা দিয়ে যায় সংখ্যারা। নীলনয়না দুই যমজ নারীর দুঃখ ছেয়ে ফেলে তাঁর ভাবনা। মেজোকাকু কি এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন?

সায়েন্স ফিকশনের সঙ্গে আমরা পরিচিত। এ বই ঠিক তা নয়। বিজ্ঞানের বই তো বটেই, তবে ফিকশন—সে হিসেবে বলা যায়, ম্যাথ ফিকশন। গাণিতিক উপন্যাস। গণিতের রানিখ্যাত নাম্বার থিওরির নানা দিক এ উপন্যাসের উপজীব্য। সেই সঙ্গে ইতিহাস, বাস্তব ও কল্পনা মিলেমিশে যায়। আমাদের প্রশ্ন করতে বাধ্য করে—যে কথা বলেছি শুরুতে—একটি গাণিতিক ধাঁধা কি একজন মানুষকে পরাজিত করতে পারে?

বইটির ভাষা স্বাদু, টেনে পড়ার মতো। গণিতের জটিল অনেক বিষয় উঠে এসেছে সহজ ভাষায়, গল্পচ্ছলে। অ্যাপোস্টোলোস দোক্সিয়াদিসের *আঙ্কেল পেট্রোস অ্যান্ড গোল্ডবাখ'স কনজেকচার*-এর ছায়া অবলম্বনে রচিত এ বই বাংলার বিজ্ঞান বইয়ের জগতে ভিন্ন ধরনের সংযোজন।

গণিতে যাঁদের আগ্রহ আছে, যাঁরা ভাবতে চান, ইতিহাসের গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়তে পছন্দ করেন, বাস্তব ও কল্পনার সীমারেখা পেরিয়ে যেতে চান এবং উপলব্ধির নানা ধাপ পেরিয়ে বাস্তবের কঠোর কঠিনে ঠুকরে গিয়েও স্বপ্ন দেখতে চান, এ বই তাঁদের ভালো লাগবে। পাওয়া যাবে অফলাইন ও অনলাইন বইয়ের দোকানে।

গ্রন্থনা : মুনিয়া মানতাসা

নতুন বই

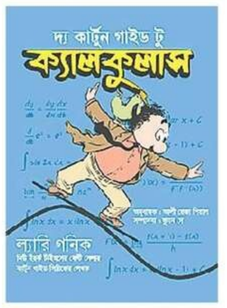

দ্য কার্টুন গাইড টু ক্যালকুলাস
ল্যারি গনিক
অনুবাদ : আলী রেজা পিয়াল
প্রকাশক : তাম্রলিপি
পৃষ্ঠা : ২৩৬
দাম : ৮০০ টাকা
কার্টুন ও গল্পে সহজ ভাষায় ক্যালকুলাস পরিচিতি। ১৪টি ছোট অধ্যায়ে মজার ছলে শেখা যাবে ক্যালকুলাসের মূল বিষয়গুলো।

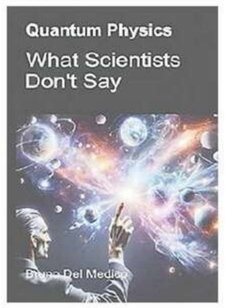

কোয়ান্টাম ফিজিকস : হোয়াট সায়েন্টিস্টস ডোন্ট সে
ব্রুনো ডেল মেডিকো
প্রকাশক : পেনসার ডাইভার্সো
পৃষ্ঠা : ১৮২
দাম : ১৭ ডলার
কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা কীভাবে সংজ্ঞায়িত করে বাস্তবতাকে? আকর্ষণীয় ও কৌতূহলী সব প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক উত্তর...

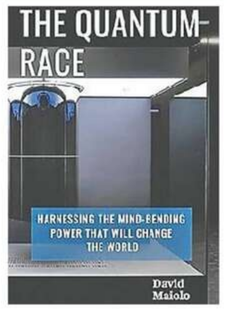

দ্য কোয়ান্টাম রেস
ডেভিড মায়োলো
পৃষ্ঠা : ৩৮৫
দাম : ১২.৯৯ ডলার
কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে গুগল, আইবিএমের মতো বড় প্রতিষ্ঠান। এই কোয়ান্টাম দৌড়ে কে জিতবে? সহজ ভাষায় কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ভেতরের কথা...

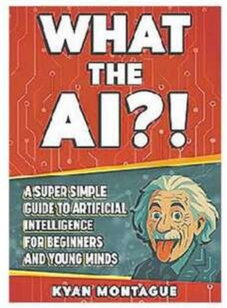

হোয়াট দ্য এআই
কান মন্টেগ
পৃষ্ঠা : ১৪৪
দাম : ৬.৯৯ ডলার
সহজ ভাষায় কিশোর-তরুণদের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিচয়, এআই মডেলের ভেতরের কথা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শেখার পদ্ধতিসহ অনেক কিছু...

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

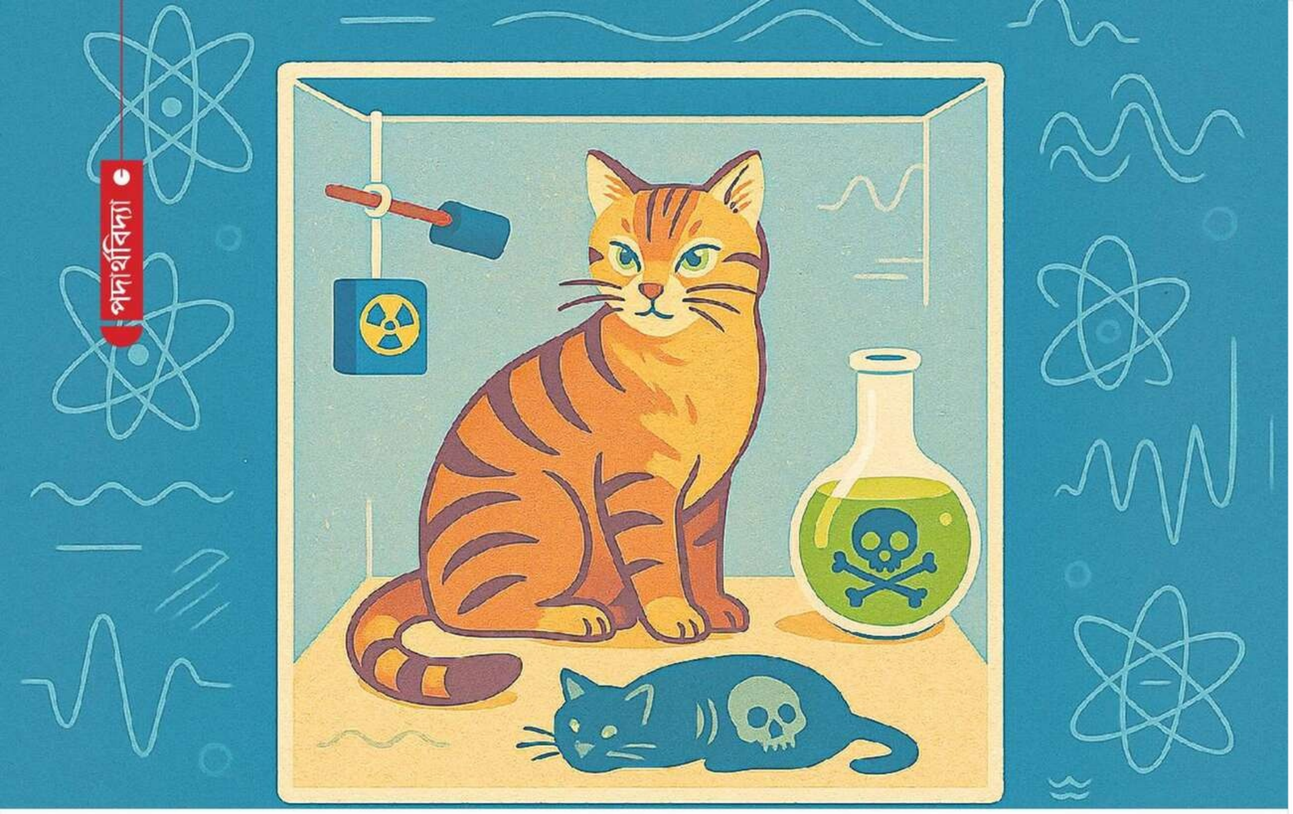

কোয়ান্টামের গোলকধাঁধা

আবুল বাসার

একটা বিড়াল একই মুহূর্তে জীবিত আর মৃত—এ কেমন কথা? কোয়ান্টাম মেকানিকসের প্রয়োগ আমাদের চেনাজানা জগতে এসে কেমন উদ্ভট রূপ নেয়, তা দেখাতেই শ্রোডিঙ্গার ভেবেছিলেন একটি বিড়ালের কথা। সেই বিড়াল আজ কোয়ান্টাম মেকানিকসের শক্তিশালী এক প্রতীকে পরিণত হওয়ার পেছনের কাহিনি...

১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি। পদার্থবিজ্ঞানের জন্য সময়টা উত্তাল। কোয়ান্টাম মেকানিকসের বেশ কিছু নতুন তত্ত্ব তত দিনে ডানা মেলেছে। পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সেগুলো মিলেও যাচ্ছে দারুণভাবে। কিন্তু স্বস্তি নয়, অস্বস্তি কাঁধে চেপে বসতে লাগল একদল বিজ্ঞানীর। সেই অস্বস্তি দিন দিন বাড়তেই থাকল। এর কারণ কোয়ান্টামজগতের অদ্ভুত সব নিয়মকানুন। পরমাণুর মতো ক্ষুদ্র কণার জগতের এসব রীতিনীতি বড় পরিসর বা বাস্তব জগতের সঙ্গে মিলছে না। সেগুলো একেবারেই আলাদা।

এই যেমন কোপেনহেগেন ব্যাখ্যার কথাই বলা যাক। এ ব্যাখ্যা অনুসারে, কোয়ান্টামজগতে 'সুপারপজিশন' নামে একটা ঘটনা ঘটে। একটা কণা একই সঙ্গে একাধিক অবস্থায় থাকার নাম সুপারপজিশন। আমাদের চেনা জগতে সেটা অসম্ভব। উদ্ভট বললেও কম বলা হয়। চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের ধারণায় সেটা নিষিদ্ধ। কিন্তু কোয়ান্টামজগতে সেটা শুধু সম্ভবই নয়, আমাদের অজান্তে ঘটছে প্রতিনিয়তই। সেখানে একটি কণা একই সঙ্গে একাধিক অবস্থায় থাকতে পারে। এই গোলমেলে পরিস্থিতিতেই জন্ম নিল একটা কাল্পনিক বিড়াল। সেই বিড়ালের জীবন-মৃত্যু হয়ে উঠল কোয়ান্টাম নামের রহস্যময় জগতের প্রতীক। এই বিড়ালের নাম—শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল।

অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ আরউইন শ্রোডিঙ্গার (এরভিন শ্রোডিঙ্গার) ছিলেন কোয়ান্টাম মেকানিকসের অন্যতম স্থপতি। ইলেকট্রনের জন্য তরঙ্গ সমীকরণ প্রণয়ন করেছেন ১৯২৬ সালে। সেই সমীকরণ ইলেকট্রনের গতিবিধি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারল ঠিকই, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের হৃৎপিণ্ডে বিঁধে গেল সম্ভাবনার কাঁটা। তাই তিনি নিজেই এই তত্ত্বের কিছু আপাত অযৌক্তিক পরিণতি নিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। এ ছাড়া বিশেষ করে সুপারপজিশনের ধারণাটি তাঁর কাছে কেমন যেন অস্বস্তিকর ঠেকত। ক্ষুদ্র কণার ক্ষেত্রে না হয় ব্যাপারটা মানা যায়, কিন্তু বাস্তব জগতেও কি একই নিয়ম প্রযোজ্য?

এই গোলমেলে প্রশ্নের উত্তরে দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেলেন পদার্থবিজ্ঞানীরা। এক পক্ষে কোয়ান্টাম মেকানিকসের গডফাদার হিসেবে পরিচিত নীলস বোর ও তাঁর তরুণ শিষ্যরা। প্রতিপক্ষে আছেন স্বয়ং আইনস্টাইন, কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের আরেক দিকপাল। আর আছেন শ্রোডিঙ্গার। আইনস্টাইনের সঙ্গে নীলস বোরের এ বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। ১৯৩০ সালের সলভে কনফারেন্সের সময় তাঁদের সেই বিতর্ক পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনো আলোচনার বিষয়। কোয়ান্টামজগতের রহস্যময়, উদ্ভট ব্যাখ্যা নিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা করতেন শ্রোডিঙ্গার। দুজনের মধ্যে উত্তপ্ত চিঠি চালাচালিও চলত। আইনস্টাইনও কোয়ান্টাম মেকানিকসের কিছু ব্যাখ্যা নিয়ে সংশয়ী ছিলেন। দুই বিজ্ঞানীর ভেতর পত্রালাপ থেকে জানা যায়, তাঁরা একটি পূর্ণাঙ্গ ও বোধগম্য তত্ত্বের অভাব অনুভব করছিলেন।

ঠিক এই প্রেক্ষাপটে, ১৯৩৫ সালে শ্রোডিঙ্গার একটি থট এক্সপেরিমেন্ট বা মানস পরীক্ষা প্রস্তাব করেন। উদ্দেশ্যটা সরল। প্রতিপক্ষের দেওয়া কোয়ান্টাম মেকানিকসের সুপারপজিশনের ধারণাটিকে স্রেফ গুঁড়িয়ে দিতে চান তিনি। তাঁর চিন্তাটা ছিল, একটি স্থূল বস্তুর ওপর প্রয়োগ করে যদি এ ধারণার আপাত অযৌক্তিকতা তুলে ধরা যায়, তাহলে সেটা সহজেই প্রমাণ করা সম্ভব। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, ক্ষুদ্র জগতের কোয়ান্টাম নিয়ম যদি সরাসরি বড় বস্তুর ক্ষেত্রে খাটে, তাহলে আমাদের বাস্তব জগৎ কতটা অদ্ভুত ও পরস্পরবিরোধী হয়ে উঠবে। আসলে শ্রোডিঙ্গারের এই মানস পরীক্ষা নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তৈরি করা হয়নি; বরং এটি ছিল কোয়ান্টাম মেকানিকসের কোপেনহেগেন ব্যাখ্যার একটি সমালোচনা।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কোপেনহেগেন ব্যাখ্যাটা কী? চলুন, মূল ব্যাপারটা আলোচনার আগে সেটা আরেকটু জানা যাক।

২.

বিশ শতকের গোড়ার দিকে যখন কোয়ান্টাম মেকানিকসের জন্ম হয়, তখন এর ব্যাখ্যা নিয়েও নানা মতভেদ দেখা দেয়। এ তত্ত্ব অনুসারে দেখা গেল, পরমাণুদের অদ্ভুত দুনিয়ায় কণা একই সঙ্গে একাধিক অবস্থায় থাকতে পারে। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে, সেখানে অনিশ্চয়তাই যেন শেষ কথা। এ জগৎকে বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে বিজ্ঞানীরা বহু বছর ধরে চেষ্টা চালিয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও বিতর্কিত ব্যাখ্যাগুলোর একটি হলো কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশন বা কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা। ১৯২০-এর দশকের প্রায় শেষ দিকে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে নীলস বোরের নেতৃত্বে একদল তরুণ বিজ্ঞানী এই ব্যাখ্যার মূল ভিত্তি স্থাপন করেন। ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদার্থবিজ্ঞানীও যুক্ত ছিলেন এর সঙ্গে।

পরমাণুদের অদ্ভুত দুনিয়ায় কণা একই সঙ্গে একাধিক অবস্থায় থাকতে পারে। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে, সেখানে অনিশ্চয়তাই যেন শেষ কথা

কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা অনুসারে, কোনো কোয়ান্টাম সিস্টেম যতক্ষণ না পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, ততক্ষণ সেটি সম্ভাব্য সব অবস্থার সুপারপজিশনে থাকে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই সিস্টেম একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় 'ভেঙে' পড়ে বা ওয়েভ ফাংশন কলাপস করে। অর্থাৎ কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশন কোয়ান্টামজগতের নিয়মকানুন এবং আমাদের পর্যবেক্ষণের ভূমিকার ওপর জোর দেয়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে, কোনো কোয়ান্টাম কণাকে—যেমন ইলেকট্রন—আমরা যতক্ষণ পর্যবেক্ষণ না করছি, ততক্ষণ সেগুলো কোনো নির্দিষ্ট অবস্থায় থাকে না, বরং সম্ভাব্য সব অবস্থার একটি মিশ্রণ বা সুপারপজিশনে বিরাজ করে। অনেকটা যেন একই সঙ্গে অনেকগুলো অস্পষ্ট ছায়া। এই সুপারপজিশন হলো সম্ভাবনার জগৎ। সেখানে কণাটি কোথায় থাকতে পারে, তার অসংখ্য সম্ভাবনা মিশে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে কোনো পর্যবেক্ষক সেই ইলেকট্রনের দিকে তাকান, কিংবা কোনো যন্ত্র দিয়ে তার অবস্থান মাপার চেষ্টা করেন, অমনি ঘটে এক অভাবনীয় ঘটনা—সঙ্গে সঙ্গে 'ওয়েভ ফাংশন "কলাপস"' করে। যেন জাদুদণ্ড ছোঁয়ানো মাত্রই ওই অস্পষ্ট ছায়ারা একটি নির্দিষ্ট, বাস্তব অবস্থানে স্থির হয়ে আসে। ইলেকট্রনটি তার সুপারপজিশন ভেঙে ফেলে এবং পর্যবেক্ষকের চোখের সামনে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে আত্মপ্রকাশ করে।

এই ব্যাখ্যায় পর্যবেক্ষকের ভূমিকা কেবল তথ্য সংগ্রহকারীর নয়, বরং সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর মতো। তার মাপার বা দেখার কাজটি যেন কোয়ান্টাম সম্ভাবনার মেঘ থেকে একটি নির্দিষ্ট বাস্তবতাকে টেনে বের করে আনে। যতক্ষণ না পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, ততক্ষণ বাস্তবতা যেন অস্পষ্ট ও অনির্ধারিত। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই যেন প্রকৃতি একটি 'সিদ্ধান্ত' নেয়—কণাটি ঠিক কোথায় হাজির হবে।

একটা বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক। কল্পনা করুন, একটি কয়েন ঘোরানো হচ্ছে। যতক্ষণ না সেটি মাটিতে পড়ছে, ততক্ষণ সেটি একই সঙ্গে হেডস ও টেলস—দুটোই। কোয়ান্টাম কণার অবস্থাও অনেকটা তেমন। যতক্ষণ না আমরা পরিমাপ করছি, ততক্ষণ তারা যেন সম্ভাব্য সব 'পিঠ'-এ মিশে থাকে। পরিমাপ করার মুহূর্তেই যেন মুদ্রাটি থেমে একটি নির্দিষ্ট দিকে স্থির হয়। মানে কণাটি তখন একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় 'ভেঙে' পড়ে। একেই বলে ওয়েভ ফাংশন কলাপস করা।

আগেই বলেছি, এই ধারণা চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। চিরায়ত জগতে বস্তুর একটি নির্দিষ্ট ও স্বাধীন বাস্তবতা থাকে, পর্যবেক্ষক থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু কোয়ান্টাম জগতে, কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা অনুসারে, পর্যবেক্ষণের কাজটি মৌলিক। পর্যবেক্ষণ ছাড়া কোয়ান্টাম সিস্টেমের কোনো নির্দিষ্ট ভৌত বৈশিষ্ট্য (যেমন অবস্থান বা ভরবেগ) অর্থবহ নয়। কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা, কোয়ান্টাম মেকানিকসের এক প্রভাবশালী ভাষ্য, পরমাণুর রহস্যময় জগতে আমাদের চিরায়ত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। এই ব্যাখ্যায় একজন সাধারণ দর্শক বা পর্যবেক্ষক যেন কেবল দর্শক নন, বরং কোয়ান্টাম নাটকের এক গুরুত্বপূর্ণ কুশীলব। তার চোখ যেন পর্দার আড়ালে থাকা সম্ভাবনার জট খুলে বাস্তবতার রূপ দেয়।

সে কারণেই কোপেনহেগেন ব্যাখ্যার কট্টর সমালোচক ছিলেন আইনস্টাইন। তিনি কোয়ান্টামজগতের অনিশ্চয়তা এবং সম্ভাব্যতাভিত্তিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করতেন না। এ বিষয়েই তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি, 'ঈশ্বর পাশা খেলেন না।' কারণ, তিনি মনে করতেন, প্রকৃতির একটি নির্দিষ্ট ও বাস্তব অবস্থা থাকা উচিত, যা আমাদের পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল নয়। এদিকে শ্রোডিঙ্গার নিজেও কোয়ান্টাম মেকানিকসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও কোপেনহেগেন ব্যাখ্যার কিছু দিক নিয়ে সংশয়ী ছিলেন। তিনি 'ওয়েভ ফাংশন "কলাপস"'-এর ধারণাটিকেও রহস্যময় বলে মনে করতেন। শ্রোডিঙ্গার প্রশ্ন তুলেছিলেন, এই 'পর্যবেক্ষণ' প্রক্রিয়াটি ঠিক কখন এবং কীভাবে ঘটে? কোপেনহেগেন ব্যাখ্যার সুপারপজিশন ধারণাকে অযৌক্তিক প্রমাণ করতে তাই একটা থট এক্সপেরিমেন্টের প্রস্তাব করেন তিনি।

পরীক্ষাটা অনেকটা এ রকম: ধরা যাক, একটা বাক্সের ভেতরে রাখা আছে একটি বিড়াল। সেই সঙ্গে আছে একটি তেজস্ক্রিয় পরমাণু, একটি তেজস্ক্রিয়তা শনাক্ত করার যন্ত্র (যেমন

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

গাইগার কাউন্টার), এ যন্ত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে বাঁধা একটি হাতুড়ি এবং একটি বিষের বোতল। পরমাণুটি যদি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ করে ভেঙে যায়, অর্থাৎ পরমাণুটির তেজস্ক্রিয় ক্ষয় হলে যন্ত্রটি সেই বিকিরণ শনাক্ত করবে। তাতে হাতুড়িটি সক্রিয় হয়ে বিষের বোতলটি ভেঙে দেবে। সেই বিষক্রিয়ায় মারা যাবে বিড়ালটি। আর যদি পরমাণুটি বিকিরণ না করে, অর্থাৎ এর তেজস্ক্রিয় ক্ষয় না হয়, তাহলে বিষের বোতল অক্ষত থাকবে। বিড়ালটিও বেঁচে থাকবে।

কোয়ান্টাম মেকানিকসের কোপেনহেগেন ব্যাখ্যামতে, যতক্ষণ না আমরা বাক্সটি খুলছি এবং পরমাণুটির অবস্থা দেখছি, ততক্ষণ পরমাণুটি একই সঙ্গে বিকিরণ করা এবং না করার সুপারপজিশন অবস্থায় থাকবে। অর্থাৎ পরমাণুটি একই সঙ্গে তেজস্ক্রিয়ভাবে অক্ষত এবং অক্ষত নয়—অনেকটা যেন একটা মুদ্রাকে ঘোরানোর পর যতক্ষণ না সেটি থামছে, ততক্ষণ সেটি একই সঙ্গে হেডস ও টেলস—দুটোই।

প্রশ্ন হলো, পরমাণুটি যদি একই সঙ্গে দুটো অবস্থায় থাকে, তাহলে বিড়ালটির অবস্থাই-বা কী হবে? কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে, বাক্স না খোলা পর্যন্ত বিড়ালটিও একই সঙ্গে জীবিত ও মৃত—এই সুপারপজিশন অবস্থায় থাকবে! অর্থাৎ বিড়ালটি একই সঙ্গে ৫০ ভাগ মৃত ও ৫০ ভাগ জীবিত! আমাদের চেনা বাস্তব জগতে সেটা একেবারেই অসম্ভব। একটা বিড়াল একই মুহূর্তে জীবিত আর মৃত—এটা কেমন কথা?

এই ব্যাখ্যায় অসন্তুষ্ট ছিলেন আইনস্টাইনও। তাঁর বাসায় অতিথি বেড়াতে এলে তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আকাশে চাঁদের দিকে একবার তাকান তো। একটা ইঁদুর ওটার দিকে তাকিয়েছে বলেই কি হঠাৎ ওটা লাফ দিয়ে অস্তিত্বশীল হয়েছে?'

শ্রোডিঙ্গার এই কাল্পনিক পরীক্ষাটির অবতারণা করেছিলেন কোয়ান্টাম মেকানিকসের এই অদ্ভুত সুপারপজিশনের ধারণাটির অযৌক্তিকতা তুলে ধরার জন্য। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, কীভাবে ক্ষুদ্র জগতের কোয়ান্টাম নিয়ম বৃহৎ বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তার উদ্ভট বা অযৌক্তিক পরিণতি আসতে পারে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কোয়ান্টাম মেকানিকসের অসম্পূর্ণতা বা এর ব্যাখ্যার সমস্যাগুলো তুলে ধরা।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যাখ্যা উদ্ভট বা অযৌক্তিক হলে কী হবে, বাস্তবে কিন্তু পরমাণু আসলেই সুপারপজিশন অবস্থায় থাকে। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে কোয়ান্টাম কম্পিউটারসহ আধুনিক অনেক প্রযুক্তি। অর্থাৎ কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যাখ্যা যেমনই হোক, প্রকৃতিতে সত্যিই এমনটা ঘটতে দেখা যায়।

যা-ই হোক, এই পরীক্ষা বাস্তব না হলেও, এটি কোয়ান্টাম মেকানিকসের ব্যাখ্যা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে দীর্ঘ বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। কোয়ান্টামজগৎ এবং আমাদের চেনা চিরায়ত জগতের মধ্যকার সীমারেখা কোথায়, কীভাবে কোয়ান্টাম সুপারপজিশন বৃহৎ বস্তুর ক্ষেত্রে ভেঙে যায়, তা নিয়ে গবেষণা চলছে আজও।

এই কাল্পনিক বিড়াল কোয়ান্টাম মেকানিকসের সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রভাবশালী প্রতীকগুলোর একটি হয়ে উঠেছে। এটি আমাদের শেখায় যে প্রকৃতির নিয়ম আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বাইরেও অনেক অদ্ভুত এবং রহস্যময় হতে পারে। বাক্সবন্দী সেই বিড়াল আজও বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে। কারণ, বিজ্ঞানীরা এখনো একমত হতে পারেননি যে কোয়ান্টামের জগৎ কি সত্যিই এত গোলমেলে, নাকি এর পেছনের রহস্য আমরা এখনো পুরোপুরি ভেদ করতে পারিনি?

লেখক : নির্বাহী সম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা

সূত্র : *কোয়ান্টাম/* মনজিৎ কুমার
প্যারালাল ওয়ার্ল্ডস/ মিচিও কাকু,
*ফিজিকস অব দ্য ইমপসিবল/*মিচিও কাকু,
*কোয়ান্টাম তত্ত্বের জনক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক/*আবুল বাসার
উইকিপিডিয়া

শব্দজট ৩

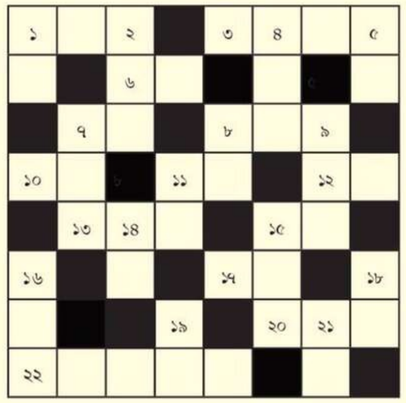

বাঁ থেকে ডানে

১. বিজ্ঞানের রানী বা অঙ্কশাস্ত্র। ৩. সচেতনতার সমার্থক শব্দ। ৬. যে সরলরেখার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। ৭. ত্বকের বাইরের স্তরের ফলিকল থেকে উৎপন্ন চিকন লম্বা সুতার মতো প্রোটিন তন্তু। ৮. তাপ প্রয়োগে কোনো পদার্থের কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় রূপান্তরের প্রক্রিয়া। ১০. কোনো বস্তুর আলোকীয় প্রতিচ্ছবি। ১১. মেরুদণ্ডী প্রাণীর মাথাকে ধড়ের সঙ্গে যুক্ত করে যে অঙ্গ। ১২. এক মুহূর্তের ১২ ভাগের ১ ভাগ। ১৩. নীপ নামে পরিচিত একটি গাছ। ১৫. তথ্যকে প্রতীকীভাবে প্রকাশ করার একটি সংক্ষিপ্ত উপায়। ১৭. বালু ও একপ্রকার ক্ষার থেকে তৈরি স্বচ্ছ ও ভঙ্গুর বস্তু। ২০. লেখার কাজে ব্যবহৃত একটি উপকরণ। ২২. প্রোটোপ্লাজমের সবচেয়ে ঘন, পর্দাঘেরা এবং প্রায় গোলাকার অংশ।

ওপর থেকে নিচে

১. এই একবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম *Triticum Aestivum*। ২. পদার্থের চারটি অবস্থার একটি। ৪. সুইডিশ শিল্পপতি ও ডিনামাইটের উদ্ভাবক। ৫. শ্রেণিবিন্যাসের একটি ধাপ। ৭. যেসব বস্তুর আকর্ষণ ও দিকনির্দেশক ধর্ম আছে। ৮. কতগুলো রাশির যোগফলকে ওই রাশির সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ফল পাওয়া যায়। ৯. যেসব জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো আছে। ১১. রক্তরস থেকে উৎপন্ন পানি। ১৪. কোনো পদার্থের ভৌত অবস্থা। ১৫. একটি গাণিতিক ধারণা, যা কোনো সংখ্যাকে বারবার গুণ করার প্রক্রিয়া বোঝায়। ১৬. যার মাধ্যমে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। ১৮. অত্যন্ত ছোয়াঁচে ও ভাইরাসঘটিত রোগ। ১৯. কোনো অস্বচ্ছ বস্তু আলোর পথে বাধা সৃষ্টি করলে আলোর অভাবে যে অন্ধকার জায়গা তৈরি হয়। ২১. খাড়াভাবে সমকোণে অবস্থিত যেকোনো সরলরেখা।

সমাধান পাঠিয়ে জিতে নিন পুরস্কার!

একটি কাগজে বড় করে লিখুন 'শব্দজট ৩', তারপর উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন। খামের ওপর বড় করে লিখতে হবে 'শব্দজট ৩', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে বিজ্ঞানচিন্তার ঠিকানায়। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে দৈবচয়নে দুজন পাবেন বিশেষ পুরস্কার!
উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ মে ২০২৫।
উত্তর পাঠান : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

শব্দজটটি তৈরি করেছেন **সুমন মাহমুদ**

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

ধাঁধা

ভ্রমণ-রহস্য

আইনস্টাইনের ধাঁধা বা আইনস্টাইনস রিডল। বলা হয়, মাত্র ২ শতাংশ মানুষ এ ধরনের ধাঁধার উত্তর দিতে পারেন। বাকি ৯৮ শতাংশই ভুল করেন। আপনি কোন দলে? ভালো কথা, মাথা খাটিয়ে সমাধান করতে পারলে রয়েছে বিশেষ পুরস্কার! তাহলে হয়ে যাক!

চার বন্ধু ঘুরতে যাবে। তারা পাশাপাশি বসে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, কোথায় যাওয়া যায়। কিন্তু জায়গাটা ঠিক করতে পারছে না। কারণ, কারও সঙ্গে মিলছে না কারও মত। একজন যেতে চায় পাহাড়ে, তো অন্যজন জঙ্গলে। একজন আবার যেতে চায় নদীভ্রমণে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিল, প্রত্যেকে আলাদা জায়গায় ঘুরতে যাবে। এই মুহূর্তে সবার টি-শার্টের রং আলাদা। যাওয়ার আগে তারা ঠিক করল, কে কত দিনের ভ্রমণে যাচ্ছে। দূরত্ব অনুসারে ২ থেকে ৫ দিনের জন্য ঘুরতে যাচ্ছে তারা।

এখন এই চার বন্ধু ও তাদের ভ্রমণসম্পর্কিত ১১টি তথ্য এখানে দেওয়া আছে। সেগুলো ঘেঁটে আপনাকে একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। প্রথমে তথ্যগুলো দেখা যাক।

১. যে ২ দিনের ভ্রমণে যাচ্ছে, সে বসেছে দ্বিতীয় স্থানে।
২. যে ৩ দিনের ভ্রমণে যাচ্ছে, সে বসেছে প্রথম অবস্থানে।
৩. রায়হান পরেছে কমলা রঙের শার্ট।
৪. যে নীল শার্ট পরে, সে বসেছে তৃতীয় স্থানে।
৫. সুব্রত জঙ্গল দেখতে চায়।
৬. জলিল বসেছে দ্বিতীয় স্থানে।
৭. যে ৪ দিনের ভ্রমণে যাচ্ছে, সে আছে নদী ভ্রমণেচ্ছু বন্ধুর পরে।
৮. যে ৫ দিনের ভ্রমণে যাচ্ছে, সে বসেছে যেকোনো এক পাশে।
৯. কালো শার্ট পরা ব্যক্তি বসেছে সবার শেষে।
১০. যে পাহাড় দেখতে চায়, সে-ও বসেছে সবার শেষে।

এখন খুঁজে বের করুন : নদীভ্রমণে যাবে কে?

এই ধাঁধা ধাপে ধাপে সমাধান করা খুব সহজ। চাইলে নিচের ছকের মতো একটা ছকও বানিয়ে নিতে পারেন।

টি-শার্টের রং : কালো, নীল, কমলা, সাদা
নাম : রায়হান, জলিল, শান্ত ও সুব্রত
ভ্রমণের স্থান : পাহাড়, জঙ্গল, নদী ও আগ্নেয়গিরি
ভ্রমণের সময় : ২, ৩, ৪ ও ৫ দিন

বৈশিষ্ট্য/স্থান	১ম স্থান	২য় স্থান	৩য় স্থান	৪র্থ স্থান
টি-শার্টের রং				
নাম				
ভ্রমণের স্থান				
ভ্রমণের সময়				

আইনস্টাইনের ধাঁধার গত সংখ্যার বিজয়ী

শামস শাহরিয়ার, রাজশাহী
মিশুক রুদ্র, বড় বাজার, কুষ্টিয়া
আয়শা হক, উত্তরা, ঢাকা

সমাধান পাঠিয়ে জিতে নিন পুরস্কার!

একটি কাগজে বড় করে লিখুন 'আইনস্টাইনের ধাঁধা', তারপর উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন। খামের ওপর বড় করে লিখতে হবে 'আইনস্টাইনের ধাঁধা', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে দৈবচয়নে তিনজন পাবেন বিশেষ পুরস্কার! উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ মে ২০২৫।

উত্তর পাঠান : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

প্রথমা প্রকাশিত বিজ্ঞান ও গনিতের নতুন ২টি বই

রিচার্ড ফাইনম্যান
অনুবাদ : উচ্ছ্বাস তৌসিফ
দ্য ক্যারেক্টার অব ফিজিক্যাল ল
৳ ৪৫০

কাজী আকাশ
ঝটপট গণিত
৳ ৩০০

প্রথমা ১৯ কারওয়ান বাজার ঢাকা। ০১৯৫৫ ৫৫২১৭৭ ঘরে বসে বই পেতে ভিজিট করুন : www.prothoma.com

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

বুদ্ধি আর ধৈর্যের লেভেল করো আপ!

শরীরের শক্তি বাড়ার জন্যে ব্যায়াম করতে হয়, এটা আমরা সকলেই জানি। চর্চার মাধ্যমে তুমি ১০০ কেজি ওজনও তুলতে পারবে একসময়। কিন্তু বুদ্ধি বাড়ানোর জন্যে কি কোনো ব্যায়াম আছে? আছে, বেশ বিজ্ঞানসম্মত কিছু গেমই আছে। আর এরকম তিনটা দারুণ জনপ্রিয় ও পরীক্ষিত গেম তুমি পাবে বিজ্ঞানবাক্সের ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজে। এই গেমগুলির মাধ্যমে তোমার ধৈর্য ও বুদ্ধি দুটোই বাড়বে। চলো পরিচিত হওয়া যাক এই গেমগুলির সাথে।

ব্রেইন বুস্টার

৮ টা ধাতব পাজল আছে এখানে। প্রত্যেকটার জন্যে আলাদা ট্রিক। কোন দিক ধরে ঘুরাতে হবে, কোথায় আটকে আছে সব খুঁজে বের করতে গিয়ে তোমার প্রবলেম সলভিং ও ফোকাস দুটোই শার্প হবে। ধাতব পিসগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেলতে খেলতে আঙ্গুলের নিয়ন্ত্রণ উন্নত হয়ে যাবে। ছবি আঁকা বা এই জাতীয় অন্যান্য হাতের কাজে তুমি ভবিষ্যতে অনেক সুফল পাবে।

ট্যানগ্রাম

প্রাচীন চাইনিজ গেম ট্যানগ্রাম। বুদ্ধির খেলা হিসেবে বহু বছর ধরে পরিচিত ও জনপ্রিয়। ৭ টা জ্যামিতিক শেপ দিয়ে কয়েক হাজার ডিজাইন তৈরি করা যাবে। ড্রাগন থেকে স্পোর্টস-কার, যা খুশি! একটা সমস্যার একাধিক সমাধান থাকতে পারে এই মাইন্ডসেটটাও তোমার ট্যানগ্রাম থেকেই তৈরি হবে। পাশাপাশি তোমার স্প্যাশিয়াল সেন্স উন্নত হবে এবং তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের প্রাথমিক ধারণাও পাবে।

ফোকাস চ্যালেঞ্জ

সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ক্রল করা থামাতে পারছো না? চলে তবে শুরু করা যাক মনোযোগ ধরে রাখার কোর্স! ফোকাস চ্যালেঞ্জে তুমি খেলতে পারবে ধৈর্যের খেলা! চ্যালেঞ্জটা হলো, একটা অ্যালুমিনিয়াম লুপকে একটা তারের মধ্যে দিয়ে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিয়ে যেতে হবে। তবে শর্ত হলো, তারটি স্পর্শ করা যাবে না। স্পর্শ করলেই Buzzer বেজে উঠবে। এখানে তিনটা ডিফিকাল্টি লেভেল আছে। নিজে খেলার পাশাপাশি বন্ধুদেরও চ্যালেঞ্জ জানাতে পারো!

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজটি
তুমি এখন ২০০ টাকা ডিসকাউন্টে
কিনতে পারবে বিজ্ঞানবাক্সের ওয়েবসাইট থেকে।

অর্ডার করতে
কিউ আর কোডটি
স্ক্যান করো

ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ ছাড়াও আমাদের আছে আলো, তড়িৎ, চুম্বক ইত্যাদি বিষয়ে নানারকম বিজ্ঞানবাক্স। বিভিন্ন রকম সায়েন্স প্রজেক্টের আইডিয়া পেতে এই বিজ্ঞানবাক্সগুলি তোমাদের দারুণ কাজে আসবে।

বিজ্ঞানবাক্স

01847 103 102
bigganbaksho.com

বিজ্ঞানবাক্স পাওয়া যাচ্ছে
meena bazar
রকমারি.com
এছাড়াও নিকটস্থ লাইব্রেরিতে এবং
bigganbaksho.com

বিজ্ঞানবাক্স

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

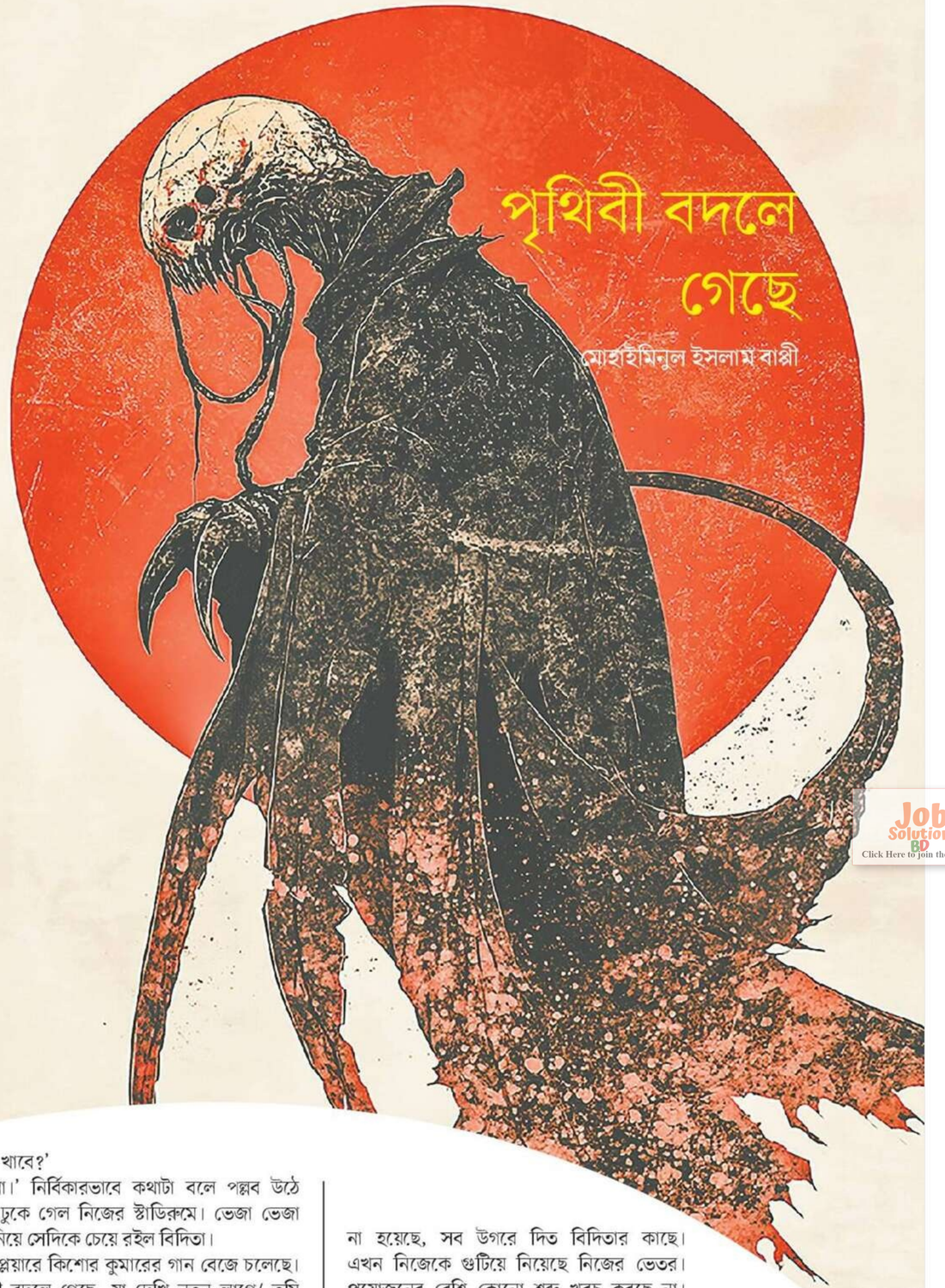

পৃথিবী বদলে গেছে

মোহাইমিনুল ইসলাম বাপ্পী

'কফি খাবে?'

'না।' নির্বিকারভাবে কথাটা বলে পল্লব উঠে গেল। ঢুকে গেল নিজের স্টাডিরুমে। ভেজা ভেজা চোখ নিয়ে সেদিকে চেয়ে রইল বিদিতা।

প্লেয়ারে কিশোর কুমারের গান বেজে চলেছে। 'পৃথিবী বদলে গেছে, যা দেখি নতুন লাগে/ তুমি আমি একই আছি, দুজনে যা ছিলাম আগে।'

গানটা শুনে তার কিঞ্চিৎ মন খারাপ হচ্ছে। পল্লব আগে যেমন ছিল, এখন তেমন নেই। বদলে গেছে, রাতারাতি। বিয়ের এত বছর পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে খানিক মরচে ধরা অস্বাভাবিক কিছু নয়, ধরতেই পারে। কিন্তু তাই বলে কেউ তাল থেকে তিল হয়ে যাবে, তা কি মেনে নেওয়া যায়!

সাগরতল থেকে আসার পর থেকে পল্লব যেন একদম অচেনা মানুষে পরিণত হয়েছে। আগে খুব বকবক করত। কাজ থেকে ফিরে কী হয়েছে না হয়েছে, সব উগরে দিত বিদিতার কাছে। এখন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে নিজের ভেতর। প্রয়োজনের বেশি কোনো শব্দ খরচ করছে না। থাকছে চুপচাপ, নিজের ভেতর। কেন? বিদিতা সেটা এখনো জানে না।

নিজের দেশ ছেড়ে সে পল্লবের সঙ্গে এই বিদেশবিভুঁইয়ে পাড়ি জমিয়েছে আজ ১৫ বছর হয়ে গেল। পল্লব তখন সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা যুবক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ডমেডেলিস্ট ছাত্র। চোখে তার তখন স্বপ্ন, উচ্চাশা আর বিদিতার জন্য তীব্র প্রেম। যুক্তরাষ্ট্রে সে স্কলারশিপটা পেয়ে যাওয়ার পর দুজন ঝটপট বিয়েটা সেরে ফেলে। নতুন দেশে পাড়ি জমায়। দুজনই বেশ আনন্দিত ছিল, সুখী ছিল।

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

পিএইচডি শেষ হলে পল্লব একটি গবেষণা সংস্থায় যোগ দেয়। সমুদ্রগর্ভের নানান বিষয়, যেমন সামুদ্রিক পরিবেশ, প্রাণিকুল, সামুদ্রিক পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করে সে। সম্মানজনক চাকরি। এই পেশার মানুষদের দারুণ সমীহ করে চলে সবাই, আমেরিকানরাও। বাড়ি, গাড়ি, নারী, সম্মান... আর কী চাই একজন পুরুষের জীবনে? ওদিকে বিদিতারও একটা স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি হয়ে যায়। দুজন সুখে-শান্তিতে সব পেয়েছির দেশে বসবাস করতে শুরু করে। ওদের ছোট বাড়িটা যুক্তরাষ্ট্রের মফস্সল এলাকায়। বাড়ি থেকে পাহাড় আর একটি উপত্যকা চোখে পড়ে। সকালে ঝলমলে সূর্যের আলোয় ভরে যায় ঘর। বিদিতার মনে হতো, তারা স্বপ্নের জীবনে বসবাস করছে। নিখুঁত একটি প্রেমের গল্প দুজনের!

তারপর কেটে গেল এতগুলো বছর। সন্তানসন্ততি নেই এই দম্পতির। দুজনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সন্তান নেবে না তারা। পৃথিবীতে জনসংখ্যা কম নাকি! একটা মানুষ কম হলে পৃথিবীর উপকার বৈ অপকার হবে না।

কিন্তু বিপত্তি বাধল পল্লবের আচরণে। এমন নয় যে আস্তেধীরে অল্প অল্প করে বদলে গেছে সে। পরিবর্তনটা হুট করেই হয়েছে এবং এই পরিবর্তন অপরিবর্তিত হওয়ারও কোনো নামগন্ধ নেই।

গবেষণার কাজে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা ট্রেঞ্চের ভেতর সপ্তাহখানেক কাটিয়েছিল পল্লব। হ্যাঁ, এক সপ্তাহ, সাতটা দিন। ফিরে এসেছে গত শনিবার। সাত দিনে কী হয়েছে তার? কারণ, ফেরার পর নিজে থেকে একটাও কথা বলেনি সে। বাড়ি এসে ব্যাগট্যাগ রেখে নিজে নিজে কফি বানিয়ে খেয়েছে। নিজ হাতে! পল্লব নিজ হাতে পানিও গরম করেনি আজ পর্যন্ত! আর কফি?

'পল্লব, তুমি ঠিক আছ?'

'হ্যাঁ' বলেই নিজের স্টাডিরুমে ঢুকে গিয়েছিল সে। ওখানেই থাকে সে আজ দিন-রাত। ফেরার পর থেকে অফিসেও যায়নি একবারও।

কিছু একটা হয়েছে সমুদ্রগর্ভে। কী সেটা? মেয়েলি কৌতূহলে মরে যাচ্ছে বিদিতা। তার চেয়েও বেশি হচ্ছে দুশ্চিন্তা। পল্লব এত বদলে গেল কী করে?

দুই.

'কী বলো বিদিতা! পলেরও একই অবস্থা। ফেরার পর থেকে মুখে একদম কুলুপ এঁটে বসে আছে।'

বিকেলে লিন্ডার সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিল বিদিতার। লিন্ডা পলের প্রেমিকা। ওরা দুজন একই সঙ্গে থাকে। বিদিতার ভালো বান্ধবী এই বিদেশি মেয়েটা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, উপলক্ষে বহুবার দেখা হয়েছে। পল আর পল্লব, নামের খানিক মিলের কারণেই কি না কে জানে, দুজনের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব।

বিকেলে কী মনে করে লিন্ডাকে ফোন করে ব্যাপারটা খুলে বলল বিদিতা। শুনে সে অবাক। পলও নাকি বদলে গেছে। তা কী করে হয়! দুজন সমুদ্রবিজ্ঞানীর মাথা একসঙ্গে বিগড়ে গেল কী করে!

'কী করা যায়, বলো তো লিন্ডা?'

'এক কাজ করো, চুপি চুপি ওর স্টাডিরুমে ঢুকে দেখো কী করে সে! তার মুঠোফোন, ল্যাপটপ ঘেঁটে দেখো।'

'সেটা মোটেও সহজ হবে না। আজকাল সে স্টাডিরুম থেকে খুব একটা বের হয় না।'

'অন্তত বাথরুমে যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই বের হবে!'

'আজকাল তো বাথরুমে গেলেও খুব দ্রুত ফিরে আসে আবার। খাওয়াদাওয়াও সেখানে করে। এমনকি ঘুমানোর জন্যও বের হয় না।'

'ধৈর্য ধরো, অপেক্ষা করো। একসময় সুযোগ পাবেই।'

বিদিতা অপেক্ষা করতে লাগল। করেই গেল সারা সন্ধ্যা। কিন্তু না, বের হলো না পল্লব। জেদ চেপে গেল এবার মেয়েটার। একটা হেস্তনেস্ত সে করেই ছাড়বে।

রাতের বেলা অবশেষে যখন রুমের বাইরে পা রাখল পল্লব, বিদিতা কিছুই বলল না তাকে। ওর দিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু করে দ্রুত পায়ে হলরুমটা পেরিয়ে সে বাথরুমে ঢুকে গেল। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল বিদিতা। এই সুযোগ।

আমেরিকার বাথরুমগুলোয় সব সময় বাইরে থেকে দরজা লাগানোর সিস্টেম থাকে না, কিন্তু ওদের বাড়িতে আছে। বাঙালি বুদ্ধি থেকেই হয়তো ওভাবে তৈরি করেছিল পল্লব। তবে সুযোগটা আজ কাজে লেগে গেল বিদিতার। দ্রুত বাইরে থেকে লাগিয়ে দিল সে দরজাটা।

তিন.

দরজা ধাক্কানোর তীব্র শব্দ শুনতে পাচ্ছে বিদিতা। কিন্তু আমলে নিচ্ছে না। তার হাতের ডায়েরিটা দেখছে মনোযোগ দিয়ে।

স্টাডিরুমে ঢুকে সে আবিষ্কার করেছে, এই কয় দিন ল্যাপটপ-মুঠোফোন ছুঁয়েও দেখেনি পল্লব। ধুলা জমে আছে ল্যাপটপের মনিটরে। একটা ডায়েরিতে সে আঁকিবুঁকি করেছে শুধু। বিদঘুটে সব আঁকাআঁকি। একটি বীভৎস প্রাণীর চেহারা দেখা যাচ্ছে তাতে। এক পায়ে দাঁড়ানো বৃহদাকার একটি প্রাণী। প্রাণীটির ধড়টা চতুর্ভুজের মতো। অসমতল চতুর্ভুজ। মাথা বলতে কিছু নেই। আছে অসংখ্য টেন্টাকল, অক্টোপাসের মতো। এমন একটা প্রাণী কেন আঁকতে যাবে পল্লব?

পড়তে পড়তে তার চোখগুলো আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল, কোঁচকাতে লাগল ভ্রু, কপালে ভাঁজ পড়ল। এ কী অবিশ্বাস্য কথা লিখে রেখেছে পল্লব?

ডায়েরিজুড়েই যে এই প্রাণীর ছবি, বিষয়টা তা নয়। একদিকে কিছু কথা লেখা আছে। কথাগুলো পড়তে যাবে, তখনই শুনতে পেল দরজা ধাক্কাচ্ছে পল্লব, ভীষণভাবে। সে উপেক্ষা করার চেষ্টা করল। মনোযোগ দিল ডায়েরি পড়ার দিকে।

পড়তে পড়তে তার চোখগুলো আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল, কোঁচকাতে লাগল ভ্রু, কপালে ভাঁজ পড়ল। এ কী অবিশ্বাস্য কথা লিখে রেখেছে পল্লব?

চার.

পল্লবের ডায়েরি থেকে

কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কী করা উচিত। কাকে বিশ্বাস করা যায়? কাকে যায় না? জানা নেই আমার। বোঝার উপায়ও নেই। যা হয়েছে, সেটা এই ডায়েরিতে লেখাও বোধ হয় উচিত হবে না। যেকোনো সময় ওদের কারও হাতে পড়ে যেতে পারে। আমি সন্দেহ করছি তাদের, এটা জানতে পারলে নিশ্চয়ই বসে থাকবে না তারা, ব্যবস্থা নেবে। সেটা হতে দেওয়া যায় না। মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ এখন আমাদের মতো গুটিকয় মানুষের হাতে টিকে আছে। সাবধান হতে হবে আমাকে।

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

তারপরও না লিখলে চিন্তাগুলো গোছাতে পারছি না!

কোথা থেকে শুরু করব? হ্যাঁ, গত মাসের ২০ তারিখে আমি আর পল গবেষণার কাজে একটা সাবমেরিনে করে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা ট্রেঞ্চে নামি। খুব ছোট একটা সাবমেরিন, তবে সরু পরিখায় ঢোকার জন্য উপযুক্ত বাহন। যদিও দুজনের বেশি মানুষ উঠলে চলাফেরা কষ্টকর হয়ে যায়। তাই পানির ওপরে একটা জাহাজে বেজ স্টেশন বানিয়েছিলাম আমরা। সব টেকনিক্যাল স্টাফ সেই জাহাজে বসে আমাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করত। সাগরতলে থাকতাম শুধু আমরা দুজন। আমাদের কাজ ছিল ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে পর্যবেক্ষণ করা, নমুনা সংগ্রহ করা ও কিছু রিডিং নেওয়া।

এমন অভিযাত্রা এবারই প্রথম নয়, করেছি আগেও। কিন্তু এবারের যাত্রা আগেরগুলোর মতো ছিল, তা বলা যাবে না। এবার বিশেষ কিছু ব্যাপার ঘটেছে।

চতুর্থ দিন রাতে হঠাৎ বেজ স্টেশনের সঙ্গে অর্থাৎ সাগরের ওপরে থাকা জাহাজের সঙ্গে আমাদের সব রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেন হলো, আমরা বুঝতে পারছিলাম না। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও সাধারণত সেটা আবার ঠিক হয়ে যায় দ্রুত। কিন্তু এবার তা হলো না। পাক্কা এক ঘণ্টা আমরা বেজের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগই করতে পারলাম না। এমন নয় যে সিগন্যাল পাইনি। যন্ত্রপাতি, সিস্টেম—সব ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু অপর পক্ষ থেকে কেউ উত্তর দিচ্ছিল না।

এক ঘণ্টা পর আমাদের টেকনিক্যাল টিমের লিডার রবার্ট এসে শান্তস্বরে জানাল, সিস্টেমের গোলযোগের কারণে এতক্ষণ যোগাযোগ করতে পারেনি তারা। ক্ষমা চাইল। কিন্তু আমি আর পল সেটা মানলাম না। সিস্টেমে কোনো সমস্যা হলে আমরাও সেটা টের পেতাম। আমরা বিজ্ঞানী, 'টেকনিক্যাল সমস্যা' বলে পার পাওয়া যাবে না আমাদের কাছে।

কিন্তু যত প্রশ্নই করি, রবার্ট খুব শান্তভাবে একই উত্তর দিচ্ছিল বারবার। একসময় সন্দেহ হলো, জাহাজে ডাকাত পড়ল না তো আবার? ওদের কেউ জিম্মি করেনি তো?

আমরা এবার কাছে থাকা একটা নেভির জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। জানালাম আমাদের উদ্বেগের কথা। তারা দ্রুতই চলে এল ঘটনাস্থলে। জানাল, সব ঠিক আছে। জাহাজে কোনো চোর-ডাকাত আসেনি।

কিন্তু এতে আমাদের সন্দেহ আরও বাড়ল। কারণ, যদি জাহাজে কিছু না থেকে থাকে, আর আমরা নেভির সঙ্গে যোগাযোগ করে এমন একটা কথা বলি, তাহলে রবার্টের রেগে যাওয়ার কথা ছিল। হেড অফিসে যোগাযোগ করে আমাদের নামে নালিশ করে দিলেও অবাক হতাম না। কিন্তু সে এসবের কিছুই করল না। আশ্চর্য ঘটনা। এ কোন রবার্ট!

এর প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর যখন আমরা ওপরে উঠলাম, কথা বললাম রবার্টের সঙ্গে, দলের অন্যদের সঙ্গে, আমরা অস্বাভাবিক কিছু পেলাম না। সবাই খুব সহজ-স্বাভাবিক আচরণ করছিল। কিন্তু এতে আমাদের মনে হতে লাগল, সবাই বুঝি জোর করে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে। কিছু একটা হয়ে গেছে জাহাজে, কিন্তু সেটা কী, আমরা বুঝতে পারছিলাম না কিছুতেই।

আমরা ডাঙার উদ্দেশে রওনা হলাম। রাতে কেবিনে ঘুমাচ্ছিলাম যখন, তখন হঠাৎ জোরে জোরে থাবা বসাল কেউ আমার কক্ষে। ভয় পেলাম।

'কে?'

ওপাশ থেকে ফিসফিস করে কেউ বলল, 'আমি পল। দরজা খোলো জলদি, কথা আছে।'

আমি দরজা খুলতেই বোতল থেকে ছুটে আসা ছিপির মতো দ্রুতবেগে ঘরে ঢুকে গেল সে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। মুঠোফোন বের করে আমাকে দেখাল। দেখলাম, একটা ছবি। বোধ হয় জাহাজের ইঞ্জিনরুমে তোলা। ছবিতে একটা রক্তাক্ত লাশ। লাশটা আর কারও নয়, রবার্টের।

নিচু গলায় সে বলল, 'রবার্ট মারা গেছে, অন্তত পক্ষে আরও ২৪ ঘণ্টা আগে। আমরা যে রবার্টকে দেখেছি, সে আমাদের রবার্ট নয়, অন্য কেউ।'

পাঁচ.

জাহাজ থেকে আমরা ভালোয় ভালোয় ফিরলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি গেলাম না। গেলাম না অফিসেও। আমাদের একটা ক্ষীণ সন্দেহ ছিল, সেটা পরখ করে দেখলাম সত্য কি না। সত্য।

পল আর আমি অনেকগুলো হাইপোথিসিস নিয়ে ভাবলাম। সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা গেল।

পৃথিবী বদলে গেছে। যে এক ঘণ্টা সময় সবার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল বেজ স্টেশনের, তখন কেউ আক্রমণ করেছে পৃথিবীতে। বেশির ভাগ মানুষকেই হত্যা করা হয়েছে, আর তাদের জায়গায় কিছু নকল মানুষকে রাখা হয়েছে।

কীভাবে বুঝলাম, সে অনেক কথা। তবে কেউ যদি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে, তাহলে দেখবে, পৃথিবীর কোনো ক্যামেরায় ওই এক ঘণ্টার কোনো ছবি নেই।

আমাদের ধারণা, এই নকল মানুষগুলো আসলে এলিয়েন, ভিনগ্রহবাসী। তারা নিশ্চয়ই মানুষের ডিএনএ থেকে তথ্য নিয়ে হুবহু প্রতিকৃতি তৈরি করেছে। আমাদের মতো অল্প কিছু মানুষ, যাদের সে সময় এলিয়েনরা হত্যা করতে পারেনি, কিংবা ইচ্ছা করেই হত্যা করেনি, তাদের বোকা বানানো ছিল এলিয়েনের উদ্দেশ্য। সম্ভবত সমাজের বিভিন্ন স্তরে থাকা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, যেমন বিজ্ঞানী, দার্শনিক, লেখক, বুদ্ধিজীবীদের তারা বাঁচিয়ে রেখেছে ভবিষ্যতের কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য।

কিন্তু একটা জায়গায় মার খেয়ে গেছে তারা। তাদের তৈরি কৃত্রিম মানুষগুলো প্রায় নিখুঁত হলেও একটা খুঁত আছে। তা হলো চোখ। এই নকল মানুষগুলোর চোখের মণি খানিকটা বাঁকানো, ঠিক গোল নয়।

পল এর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়েছে। কালের আবর্তে অভিযোজনের ধারায় চোখ একটা রহস্যময় অধ্যায়। আলোকসংবেদনশীলতা, চোখের পাতার গঠন, লেন্স তৈরি হওয়া—এসব বিষয় বেশ জটিল, অবিশ্বাস্য। যে এলিয়েনরা এতগুলো মানুষকে হত্যা করেছে, তারা বোধ হয় এতটাও বুদ্ধিমান নয় যে পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করে ফেলবে।

তবে সবচেয়ে বিষাদ লেগেছিল তখন, যখন ঘরে ফিরে বিদিতার চোখের মণি লক্ষ করেছিলাম। এই মেয়ে বিদিতা নয়। আমার বিদিতাকেও মেরে ফেলেছে ওরা! এ কোন নকল বিদিতার সঙ্গে সংসারের অভিনয় করতে হচ্ছে?

পল আর আমি সত্যিকার মানুষ খুঁজে যাচ্ছি। তাদের সঙ্গে জোট করে সম্মিলিতভাবে এই এলিয়েনদের প্রতিহত করতে হবে।

কিন্তু বিদিতার শোক আমি কাটাব কী করে?

ছয়.

বিদিতা এতটুকু পড়ে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ডায়েরির পাতার দিকে। সে বিদিতা নয়? তবে কে? এলিয়েন?

আয়নার সামনে গিয়ে নিজের চোখটা দেখে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখন দেখার সাহস হচ্ছে না।

দুরুদুরু বুকে শোবার ঘরে গেল সে। তাকাল আয়নার দিকে। কিন্তু অস্বাভাবিক তো মনে হলো না কিছু। পল্লবের কি ভুল হচ্ছে কোথাও? মানুষের চোখের মণি তো এমন বাঁকানোই থাকে, নাকি!

আসলেই কি তাই?

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

রাসায়নিক বিক্রিয়া, বিশেষত জৈব রসায়নের বিক্রিয়া বুঝতে যে বিষয়গুলো ভালোভাবে জানতে হবে, সেগুলো সহজ ভাষায়, একজন রসায়নবিদের কলমে...

এ পর্বে মূলত আলোচনা করব ইলেকট্রোফাইল ও নিউক্লিওফাইল নিয়ে। প্রসঙ্গত, অন্যান্য কিছু বিষয়ও থাকবে। ইলেকট্রোফাইল (Electrophile) কী? নামটা এসেছে ইলেকট্রনের প্রতি আসক্তি বা ইলেকট্রোফিলিসিটি থেকে। অর্থাৎ যে অণু বা অণুর অংশ (যথা কার্যকরী মূলক) ইলেকট্রন গ্রহণে আগ্রহী, সেটাকেই আমরা সাধারণভাবে বলি ইলেকট্রোফাইল। অর্থাৎ, ইলেকট্রোফাইল হলো ইলেকট্রন গ্রহীতা। ইলেকট্রোফাইলে ইলেকট্রনের ঘনত্ব কম থাকবে। এ জন্যই তো ইলেকট্রনের প্রতি আসক্তি থাকবে। জৈব যৌগে সাধারণত যৌগের বা মূলকের কার্বন পরমাণুই হবে ইলেকট্রোফাইল। অর্থাৎ কোনো কোনো কার্বন পরমাণুতে ইলেকট্রনের ঘনত্ব কম থাকবে বলেই সেই কার্বন পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করতে চাইবে। ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে তৈরি করবে নতুন বন্ধন।

ইলেকট্রোফাইলের বিপরীত হলো নিউক্লিওফাইল। ইলেকট্রোফাইল যদি ইলেকট্রন গ্রহীতা হয়, তাহলে নিউক্লিওফাইল হলো ইলেকট্রন দাতা। ইলেকট্রন কে দিতে পারবে?—নিশ্চয়ই যার কাছে ইলেকট্রন বেশি আছে বা ইলেকট্রন ধরে রাখার সামর্থ্য যার কম।

আমরা যখন সাধারণভাবে প্রকাশ করি, তখন নিচের মতো করে লিখে প্রকাশ করা হয়। একটা তিরচিহ্নের মাধ্যমে বোঝানো হয়, নিউক্লিওফাইল ইলেকট্রোফাইলকে অ্যাটাক করছে। কিংবা একজোড়া ইলেকট্রন দিচ্ছে।

বিক্রিয়ার ক্রিয়াকৌশল (Mechanism) বুঝতে হলে ইলেকট্রোফাইল ও নিউক্লিওফাইল শনাক্ত করতে পারা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর এটা শনাক্তকরণের বেশ কিছু সহজ নিয়ম আছে, যেগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হবে।

নিউক্লিওফাইল শনাক্ত করা তুলনামূলক সহজ। অ্যালকোহল, অ্যামিন, থায়োল—এগুলো নিউক্লিওফাইল। কারণ, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার এসব পরমাণুতে লোন পেয়ার বা মুক্ত জোড় ইলেকট্রন থাকে। নিচে কয়েকটি নিউক্লিওফাইলের উদাহরণ দেওয়া হলো। নিচের এ অণুগুলোর অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং সালফার পরমাণুতে ইলেকট্রন পেয়ার বা লোন পেয়ার আছে। এবং কয়টি করে লোন পেয়ার আছে, সেটা তোমরা একটু চিন্তা করলেই বের করতে পারবে। আগের পর্বগুলোয় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

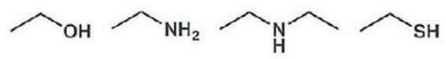

এগুলো ছাড়াও আরও নিউক্লিওফাইল আছে, বিশেষ করে কার্বন নিউক্লিওফাইল। বিভিন্ন পর্বে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে আসবে এবং পুনরাবৃত্তি হবে।

আগে আমরা অ্যালডিহাইড এবং কিটোন গ্রুপ সম্পর্কে জেনেছি। অ্যালডিহাইড এবং কিটোনে কার্বন-অক্সিজেনের দ্বিবন্ধন থাকে, যেটাকে আমরা কার্বনিলও বলি। কার্বনিল মূলকে অক্সিজেনের তড়িৎঋণাত্মকতা কার্বনের চেয়ে বেশি এবং কার্বন-অক্সিজেন দ্বিবন্ধন থাকে। তাই কার্বনিল হলো ইলেকট্রোফাইল। অর্থাৎ কার্বনিল মূলকের কার্বন পরমাণুতে ইলেকট্রনের ঘনত্ব কম থাকে, ফলে সেটা ইলেকট্রোফাইল।

তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারে, অ্যালকোহলেও তো কার্বন-অক্সিজেন বন্ধন আছে। অ্যালকোহল কি ইলেকট্রোফাইল? না, অ্যালকোহল ইলেকট্রোফাইল নয়। কিংবা বলা যায়, এটিকে ইলেকট্রোফাইল হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। বরং অ্যালকোহলকে নিউক্লিওফাইল হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। কারণ, অ্যালকোহল হলো কার্বন-অক্সিজেন একক বন্ধন।

সুতরাং ইলেকট্রোফিলিসিটি শুধু তড়িৎঋণাত্মকতার ওপরই নির্ভর করে না। সেখানে অণুর জ্যামিতিক গঠন, দ্বিবন্ধন ও ত্রিবন্ধন, বন্ধন দৈর্ঘ্য, এমনকি অণুর যে অংশকে

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

ইলেকট্রোফাইল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, সেটা বন্ধনছিন্ন (Disconnect) হওয়ার পর তার স্থিতিশীলতা ইত্যাদির ওপরও নির্ভর করে। বিভিন্ন বিক্রিয়ার উদাহরণের সময় এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে।

ইলেকট্রোফাইলকে শক্তিশালী বা দুর্বল ইলেকট্রোফাইল হিসেবেও ভাগ করা হয়। উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বিষয়গুলো সহজ করে বুঝব। যেমন অ্যালকাইল হ্যালাইড হলো ইলেকট্রোফাইল। কার্বন-হ্যালোজেন বন্ধনের কারণে কার্বন পরমাণুতে ইলেকট্রনের ঘনত্ব তুলনামূলক কম থাকে।

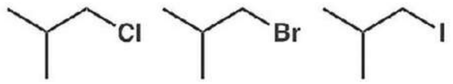

যেমন ওপরে তিনটি আইসো-বিউটাইল অণুর উদাহরণ দেওয়া হলো। এই তিনটি অণুর মধ্যে আইসো-বিউটাইল আয়োডাইড হলো শক্তিশালী ইলেকট্রোফাইল। বা বেটার ইলেকট্রোফাইল। অর্থাৎ সহজেই নিউক্লিওফাইলের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে। নিউক্লিওফাইল সহজেই আয়োডিনকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে, ফলে কার্বন-আয়োডিন বন্ধন ভেঙে যায়। ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন—তিনটি পরমাণুরই তড়িৎঋণাত্মকতা কার্বনের চেয়ে বেশি। কিন্তু কার্বন-আয়োডিন বন্ধনদৈর্ঘ্য (Bond length), কার্বন-ক্লোরিন ও কার্বন-ব্রোমিন বন্ধনের তুলনায় বড় বা বেশি। একক বন্ধন যদি বড় হয়, তাহলে সেটা দুর্বল হয়। আর দুর্বল বন্ধন ভাঙা সহজ। ফলে আইসোবিউটাইল আয়োডাইডের কার্বন-আয়োডিন বন্ধন সহজেই ভেঙে যাবে। তাই এটাকে শক্তিশালী ইলেকট্রোফাইল বলা হচ্ছে।

অন্যদিকে ফ্লোরিনের তড়িৎঋণাত্মকতা সবচেয়ে বেশি। সে বিবেচনায়, কার্বন-ফ্লোরিন বন্ধন তো শক্তিশালী ইলেকট্রোফাইল হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা শক্তিশালী ইলেকট্রোফাইল না। আগেই বলেছি, তড়িৎঋণাত্মকতাই ইলেকট্রোফাইল বিবেচনার একমাত্র শর্ত নয়। ফ্লোরিনের তড়িৎঋণাত্মকতা বেশি হওয়ায় C—F বন্ধন বেশ শক্তিশালী হয়। ফলে এই বন্ধন ভাঙতে অনেক শক্তির প্রয়োজন হয়। যেটাকে আমরা বলি Bond dissociation energy (BDE); যেমন, C—F, C—Cl, C—Br, C—I এই চারটি বন্ধনের BDE যথাক্রমে, ১১০, ৮৪, ৭২ এবং ৫৭ কিলোক্যালরি/মোল। এই মানগুলো মুখস্থ করতে হবে না। শুধু ধারণা রাখলেই হবে, কোন বন্ধন শক্তিশালী আর কোনটি তুলনামূলক দুর্বল।

আরেকটা বিষয় এখানে জানা গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হলো লিভিং গ্রুপ অ্যাবিলিটি। বিক্রিয়ায় যে গ্রুপটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, সেটাকে বলা হচ্ছে লিভিং গ্রুপ। যেমন ওপরের উদাহরণে, Cl, Br, I—এগুলো লিভিং গ্রুপ। কারণ, নিউক্লিওফাইল যখন অ্যাটাক করে, কিংবা ইলেকট্রনজোড়া প্রদান করে, তখন হ্যালোজেন পরমাণু অ্যানায়ন হিসেবে বিচ্ছিন্ন হয় বা ত্যাগ করে।

ওপরের উদাহরণ থেকে বিষয়টা বোঝা আরও সহজ হবে (পুরো বিক্রিয়া দেখানো হয়নি)। থায়োল এখানে নিউক্লিওফাইল এবং আইসো-বিউটাইল আয়োডাইড ইলেকট্রোফাইল। আঁকার সময় আমরা প্রথম তিরচিহ্ন (নীল রং) দেব নিউক্লিওফাইল থেকে ইলেকট্রোফাইলের দিকে। যেহেতু থায়োল যথারীতি এক জোড়া ইলেকট্রন দিচ্ছে, তাই আয়োডিন এক জোড়া ইলেকট্রন নিয়ে ত্যাগ করবে। কার্বন-আয়োডিন বন্ধন ভেঙে যাবে। এটা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া। সুতরাং দ্বিতীয় তিরচিহ্ন (লাল রং) হবে, কার্বন-আয়োডিন বন্ধন থেকে আয়োডিনের ওপর। এই তিরচিহ্নগুলো বস্তুত ইলেকট্রনপ্রবাহকে বোঝানোর জন্য। এভাবে বিক্রিয়ার ক্রিয়াকৌশল এঁকে দেখানোর প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'পুশ-পুল মেকানিজম'। এবং এভাবে এঁকে বোঝানো বা ব্যাখ্যা করার নিয়মই সর্বজনীন। বিজ্ঞানের সর্বজনীন ভাষা বা রীতিটা বোঝা এবং জানা থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

এই উদাহরণে আয়োডিন হলো লিভিং গ্রুপ, যেহেতু আয়োডিন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আয়োডিন বিচ্ছিন্ন হচ্ছে আয়োডাইড (I^-) হিসেবে। লিভিং গ্রুপ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে স্থিতিশীল হয়, তাহলে সেটা শক্তিশালী ইলেকট্রোফাইল। সহজ করে বললে, কেউ যদি বিচ্ছিন্ন হয়েই বেশি সুখে থাকে, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, তাহলে তো সহজেই বিচ্ছিন্ন হতে চাইবে। দ্রুত বিচ্ছিন্ন হবে। নিউক্লিওফাইলকে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না।

সুতরাং কোনো ইলেকট্রোফাইল শক্তিশালী কি না, তা বোঝার জন্য লিভিং গ্রুপ অ্যাবিলিটিও চিন্তা করতে হয়। F, Cl, Br, I—এই পরমাণুগুলোর মধ্যে কার্বন-আয়োডিন বন্ধন থেকে আয়োডিন খুব সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায়। কারণ, আয়োডিন, আয়োডাইড অবস্থায়ও বেশ স্থিতিশীল হয়। এবং এটা বোঝার জন্য কনজুগেইট অ্যাসিড এবং কনজুগেইট ক্ষারের যুক্তি প্রয়োগ করা যায়।

আয়োডাইড হলো হাইড্রোআয়োডিক অ্যাসিডের কনজুগেট বেজ। যেহেতু হাইড্রোআয়োডিক অ্যাসিড খুব শক্তিশালী, তাই এর কনজুগেট বেজ হবে খুব স্থিতিশীল। কারণ, শক্তিশালী অ্যাসিডের সংজ্ঞাই হলো কত সহজে, কত দ্রুত প্রোটন বা হাইড্রোজেন আয়ন দিতে পারে।

ঠিক একইভাবে বিবেচনা করলে ফ্লোরাইড (F^-), আয়োডাইডের তুলনায় কম স্থিতিশীল। অর্থাৎ, লিভিং গ্রুপ হিসেবে আয়োডিন বেশ চমৎকার। ভালো লিভিং গ্রুপ। ফ্লোরিন হলো দুর্বল লিভিং গ্রুপ।

এখন আমরা ইলেকট্রোফাইল হিসেবে অ্যারোমেটিক যৌগ নিয়ে আলোচনা করব। অ্যালিফেটিক যৌগের চেয়ে এদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

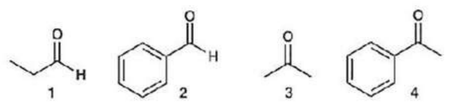

প্রথম যৌগটি হলো অ্যালিফেটিক অ্যালডিহাইড, দ্বিতীয়টি অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড (বেনজালডিহাইড)। এই দুটি যৌগের মধ্যে কোন যৌগটি শক্তিশালী ইলেকট্রোফাইল? অর্থাৎ কোন যৌগটি দ্রুত নিউক্লিওফাইলের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে?

উত্তর হলো, প্রথম যৌগটি। কেন?

কারণ, অ্যারোমেটিক রিংয়ে পাই ইলেকট্রন আছে। ৬টি পাই ইলেকট্রন কনজুগেটেড অবস্থায় থাকে। কার্বনিল মূলকের পাই বন্ধনও দুটি পাই ইলেকট্রনের কারণেই হয়। বেনজিন রিংয়ের পাই ইলেকট্রন এবং কার্বনিল মূলকের পাই ইলেকট্রন কনজুগেটেড অবস্থায় থাকে (নিচের ছবি দেখো)।

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

স্থিতিশীল কনজুগেশন তৈরি করে। ফলে অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইডের কার্বনিল মূলকের কার্বনে ইলেকট্রনের ঘনত্ব, অ্যালিফেটিক যৌগের কার্বনের তুলনায় বেশি থাকে। এ কথাটা সহজে বোঝানোর জন্য এভাবে বলেছি। বস্তুত মলিকিউলার অরবিটাল থিওরির আলোকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু মলিকিউলার অরবিটাল থিউরি উচ্চতর পর্যায়ের জন্য।

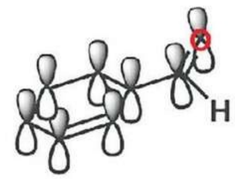

আবার তৃতীয় যৌগটি তথা অ্যাসিটোন প্রথম যৌগের তুলনায় কম শক্তিশালী ইলেকট্রোফাইল। কারণ, অ্যালডিহাইডে কার্বনিল মূলকের সঙ্গে একটি হাইড্রোজেন যুক্ত থাকে। কিটোনের বেলায় সেই হাইড্রোজেনের পরিবর্তে থাকে কার্বন। ফলে কার্বনিল মূলকের কার্বন পরমাণু অনেকটা ঢাকা বা ঘেরাও বা শিল্ডেড থাকে। অর্থাৎ স্টেরিক বেশি। নিউক্লিওফাইল সহজে অ্যাটাক করতে পারে না। নিচের ছবি থেকেও অ্যালডিহাইড এবং কিটোনের স্টেরিক পার্থক্যের কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

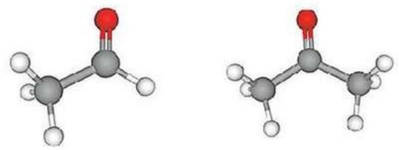

চতুর্থ যৌগটি তথা অ্যাসিটোফেনোন আবার অ্যাসিটোনের তুলনায় কম শক্তিশালী ইলেকট্রোফাইল। কারণ, চতুর্থ যৌগটির বেলায়ও বেনজিনের পাই ইলেকট্রন, কার্বনিল মূলকের পাই ইলেকট্রনের সঙ্গে কনজুগেটেড অবস্থায় থাকে।

কার্বনিল যৌগ যেহেতু খুব গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রোফাইল, তাই মনে রাখা ভালো যে সাধারণত অ্যালিফেটিক অ্যালডিহাইড অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইডের তুলনায় শক্তিশালী ইলেকট্রোফাইল। আবার অ্যালডিহাইড কিটোনের তুলনায় শক্তিশালী ইলেকট্রোফাইল।

অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড বা কিটোনের ইলেকট্রোফিলিসিটি, অ্যারোমেটিক রিংয়ের কার্যকরী মূলকের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। যেমন নিচের দুটি যৌগের মধ্যে প্রথম যৌগটি শক্তিশালী বা বেটার ইলেকট্রোফাইল। কারণ, বেনজিন রিংয়ে নাইট্রাইল (R-CN) গ্রুপ যুক্ত আছে। নাইট্রাইল গ্রুপ হলো ইলেকট্রন উত্তোলনকারী বা Electron Withdrawing Group (EWG)। বলা যায়, ইলেকট্রনকে টেনে নেয়। ফলে কার্বনিল কার্বনে ইলেকট্রনের ঘনত্ব অনেক কমে যায়। ঠিক উল্টো বিষয়টি হয় দ্বিতীয় যৌগের ক্ষেত্রে। যেহেতু মেথক্সি গ্রুপ ইলেকট্রন দাতা গ্রুপ বা Electron Donating Group (EDG), তাই কার্বনিল কার্বনে ইলেকট্রনের ঘনত্ব তুলনামূলক বেশি থাকে।

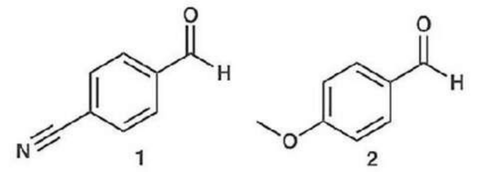

পরবর্তী পর্বে আরও কিছু ভিন্ন শ্রেণির ইলেকট্রোফাইল এবং নিউক্লিওফাইল নিয়ে আলোচনা করা হবে।

(চলবে)

লেখক : গবেষক ও লেখক

* আগের পর্ব পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

দুই চালে মাত ১০১

এখানে দুটি দাবার ধাঁধা দেওয়া আছে। ধাঁধাগুলো দুই চালে মাত করতে হবে। সঠিক সমাধানদাতা তিনজনের জন্য রকমারি ডটকমের সৌজন্যে পুরস্কার হিসেবে রয়েছে ৫০০ টাকার বই। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ মে। খামের ওপর অবশ্যই 'দুই চালে মাত ১০১' লিখবেন। উত্তরের সঙ্গে আপনার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন।

ধাঁধা ১

ধাঁধা ২

দুই চালে মাত ১০০-এর উত্তর

ধাঁধা ১ 1. Kf3 + Kh2 2. Qg2#

ধাঁধা ২ 1. …Kc4 2.Ka5 Qb5#

ধাঁধা ১

ধাঁধা ২

দাবার ধাঁধা ১০০-এর বিজয়ী

শেখ আঁখিনূর জ্যোতি, জিলা স্কুল মোড়, ময়মনসিংহ

কুশল আহমেদ, বড় মগবাজার, রমনা

মাসিদুল হক, বসুয়া, রাজশাহী

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

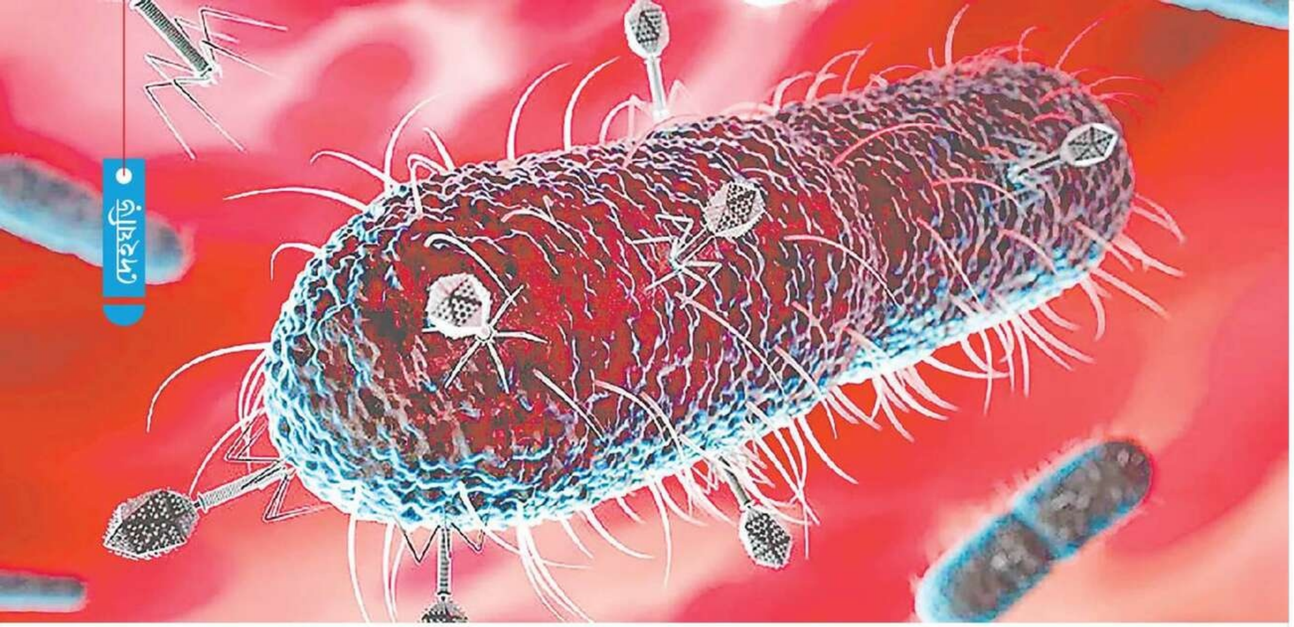

সুপারবাগের কবলে বিশ্ব, উপায় কী

ব্যাকটেরিয়া যখন অ্যান্টিবায়োটিকের মুখোমুখি হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেও টিকে থাকার চেষ্টা করে। ফলে প্রকৃতির নিয়মে তাদের ডিএনএতেও ক্রমাগত মিউটেশন বা রূপান্তর ঘটতে থাকে

শতাব্দী রায়

সালটা ১৯২৮, সেপ্টেম্বরের একদম শুরুর দিকে। সেন্ট মেরি মেডিকেল স্কুলের ব্যাকটেরিওলজির প্রফেসর সদ্য ছুটি কাটিয়ে ফিরেছেন। ল্যাবে ঢুকে পুরোনো কালচার প্লেটগুলোয় চোখ বোলাতে গিয়ে দেখলেন, একটা প্লেটে বড়সড় একটা ছত্রাক জন্মে আছে—কনটামিনেশন!

একটু বোধ হয় বিরক্ত হচ্ছিলেন নিজের অসাবধানতার জন্য। কিন্তু হঠাৎ খেয়াল করলেন, ছত্রাকটির চারপাশের একটা নির্দিষ্ট জায়গা ফাঁকা। কিন্তু তিনি তো এই প্লেটে 'স্ট্যাফাইলোকক্কাস' নামের এক ব্যাকটেরিয়া কালচার করছিলেন। তাহলে এই ছত্রাকের কি এমন কোনো হাতিয়ার আছে, যা দিয়ে সে এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে প্রতিহত করছে?

পেনিসিলিয়াম নোটেটাম নামের ছত্রাকটিকে নিয়ে এবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন তিনি। দেখা গেল, এই ছত্রাকের নির্যাস, যাকে বলা হয় 'মোল্ড জুস', সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে এদের মেরে ফেলতে পারে, সারিয়ে তুলতে পারে ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত মানুষদের। বহুদিন ধরে এমন কিছুর খোঁজেই ছিলেন আমাদের এই প্রফেসর। নাম তাঁর আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। এভাবেই তিনি আবিষ্কার করলেন হতচ্ছাড়া অণুজীবদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম কার্যকর অস্ত্র—পেনিসিলিন।

পেনিসিলিন দিয়ে শুরু, তারপর এই পথ ধরে আবিষ্কৃত হয়েছে আরও অসংখ্য অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিফাঙ্গালসহ নানা ধরনের জীবাণুনাশক ওষুধ। ফলে জীবাণুদের ওপর একরকম আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলাম আমরা। ভাবতে শুরু করেছিলাম, ওদের নিয়ে আর অত মাথা ঘামানোর কিছু নেই। তার চেয়ে বরং অসংক্রামক রোগগুলোর দিকে নজর দেওয়া যাক।

এদিকে অণুজীবেরা কিন্তু পাল্টা আক্রমণের ছক কষছিল। তার নীলনকশা আঁকা হচ্ছিল তাদের নিউক্লিক অ্যাসিড আর প্রোটিনের বুননে। পেনিসিলিনের আবিষ্কার যেমন বিস্ময় জাগিয়েছিল, তার চেয়ে দ্বিগুণ বিস্ময় নিয়ে আমরা দেখলাম, পেনিসিলিন আর কাজ করছে না অসংখ্য ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে। শুধু পেনিসিলিনই নয়, বিশ্বজুড়ে অসংখ্য অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল-প্রতিরোধী জীবাণুর উদ্ভব ঘটে গেছে। তাদের দিয়েই আমরা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছি আর দেখছি আমাদের বিশাল অস্ত্রভান্ডারকে তাদের সামনে অকেজো হয়ে পড়তে। এই ওষুধপ্রতিরোধী জীবাণুগুলোকেই বলা হয় সুপারবাগ।

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আশঙ্কাজনক ব্যাপারগুলোর একটি। যেকোনো অণুজীবই সুপারবাগ হয়ে উঠতে পারে, তবে এখন পর্যন্ত এর হার সবচেয়ে বেশি ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে। অঞ্চলভেদে এর হার ৩০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত হতে দেখা যাচ্ছে। ছত্রাকের মধ্যেও রেজিস্ট্যান্সের হার ক্রমে বেড়েই চলেছে। ফলে সাধারণ জ্বর-সর্দি বা ত্বকের রোগ সারানোও অসম্ভব হয়ে উঠছে আমাদের জন্য, ঠিক যেমনটা ছিল অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল-পূর্ববর্তী যুগে।

সুপারবাগের সুপারপাওয়ার

সুপারবাগের বর্ণনায় ব্যাকটেরিয়ার মডেলকেই আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একটি ব্যাকটেরিয়া মূলত চারটি উপায়ে অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী হয়ে উঠতে পারে। এক. এনজাইমের সাহায্যে অ্যান্টিবায়োটিককে অকার্যকর করে ফেলা। দুই. অ্যান্টিবায়োটিকের বাইন্ডিং সাইট তথা কাজের জায়গাগুলো বদলে ফেলা। তিন. ব্যাকটেরিয়ার কোষের ভেতরে অ্যান্টিবায়োটিক প্রবেশে বাধা দেওয়া এবং চার. অ্যান্টিবায়োটিককে ব্যাকটেরিয়ার কোষ থেকে ঠেলে বের করে দেওয়া।

এই বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাকটেরিয়া অর্জন করে জেনেটিক মিউটেশন বা জিনগত রূপান্তরের মাধ্যমে। এটি বাহিত হতে পারে নিউক্লিওয়েড (অবিন্যস্ত ক্রোমোজোম) বা প্লাজমিড—যেকোনোটির মাধ্যমে। এটি যেমন এক ব্যাকটেরিয়া প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চালন করতে পারে, তেমনি কিছু বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঞ্চারিত হতে পারে ভিন্ন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার মধ্যেও।

ব্যাকটেরিয়া যখন অ্যান্টিবায়োটিকের মুখোমুখি হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেও টিকে থাকার চেষ্টা করে

সুপারবাগের উদ্ভব : শিকল পরা ছল

ঠিক কোন পরিস্থিতিতে একটি ব্যাকটেরিয়া সুপারবাগ হয়ে ওঠে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, সুপারবাগের উদ্ভবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার।

জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো যেকোনো মূল্যে টিকে থাকা, সেটি আদিম এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে হোমো স্যাপিয়েন্স (মানুষ)—সবার ক্ষেত্রেই সত্য। আর যোগ্যতমরাই যে কালের আবর্তে টিকে থাকে, তা বলা বাহুল্য।

ব্যাকটেরিয়া যখন অ্যান্টিবায়োটিকের মুখোমুখি হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেও টিকে থাকার চেষ্টা করে। ফলে প্রকৃতির নিয়মে তাদের ডিএনএতেও ক্রমাগত মিউটেশন বা রূপান্তর ঘটতে থাকে। কিছু মিউটেশন ব্যাকটেরিয়াকে অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে টিকে থাকার ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা দেয়। অ্যান্টিবায়োটিকটি যথাযথ ডোজ ও সময় মেনে গ্রহণ না করা হলে ব্যাকটেরিয়ার এই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত দলগুলো (আইসোলেট) টিকে যায়, আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে অন্যান্য নিরীহ ব্যাকটেরিয়ার ওপরে। একে বলা হয় সিলেকশন প্রেশার।

এটি আমাদের শরীরের ভেতরে প্রতিনিয়ত ঘটছে। যখনই আমরা অ্যান্টিবায়োটিকের ভুল ব্যবহার করি, সেটা হতে পারে ভুল ইনফেকশনের জন্য ভুল অ্যান্টিবায়োটিক নির্বাচন, যথাযথ ডোজ যথাসময়ে গ্রহণ না করা বা ফুল কোর্স সম্পন্ন না করা, তখনই আমাদের শরীরে রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী হওয়ার সুযোগ পায়। এ ব্যাকটেরিয়াগুলোই দখল করতে থাকে আমাদের চারপাশ। একই সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিকের ভুল ব্যবহারের কারণে মারা পড়ে আমাদের শরীরের নিরীহ নরমাল ফ্লোরা, অর্থাৎ সেই অণুজীবগুলো, যারা স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো রকম রোগ সৃষ্টি না করেই আমাদের সঙ্গে সহাবস্থানে থাকে। এই নরমাল ফ্লোরা স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের শরীরে ক্ষতিকর জীবাণুকে বাসা বাঁধতে বাধা দেয়। কাজেই এরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অর্থ রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর আক্রমণের পথ আরও প্রশস্ত হওয়া।

বাঁচার উপায় কী

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের ভয়াবহতা ইতিমধ্যে পুরো বিশ্ব টের পেতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি যেন আরও খারাপের দিকে না গড়ায়, সে জন্য কাজ করার এখনই সময়। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালের যথেচ্ছ ব্যবহারই এ সমস্যার মূল। কাজেই যেকোনো মূল্যে এটা বন্ধ করতে হবে। সারা বিশ্বের নীতিনির্ধারকেরা কাজ করছেন অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ক্রয়-বিক্রয়, পোলট্রি-মৎস্যখামার-লাইভস্টকসহ সব ক্ষেত্রে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালের ব্যবহারকে সুনির্দিষ্ট নীতির আওতায় আনতে। আর ব্যক্তিপর্যায়েও আমাদের নিশ্চিত করতে হবে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালের সঠিক ব্যবহার। তা না হলে সুপারবাগের হাতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের শোচনীয় পরাজয় দেখতে হবে আমাদের, অবশ্য সেটা দেখার জন্য যদি কেউ আদৌ বেঁচে থাকে!

লেখক : শিক্ষার্থী, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

সূত্র :১. রিভিউ অব মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড ইমিউনোলজি
২. ফ্যাক্ট শিটস অন অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স, ডব্লিউএইচও
৩. বেইলি অ্যান্ড স্কটস ডায়াগনস্টিক মাইক্রোবায়োলজি

জামাল স্যারের মহাবিশ্ব
প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলামের বৈজ্ঞানিক জীবন
প্রদীপ দেব
জামাল নজরুল ইসলামকে নিয়ে আগ্রহ-উদ্দীপনা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে তাঁর মৃত্যুর পরে। এ বইয়ে তাঁর বিজ্ঞান-গবেষণা সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে।
ঘরে বসে বই পেতে www.prothoma.com ০১৭৩০০০০৬১৯
প্রথমা প্রকাশন
কারওয়ান বাজার ০১৯৫৫ ৫৫২১৭৭
শাহবাগ ০১৯৫৫৫৫২১৭৬
শেফ'স টেবিল ০১৭৩০০০০৬০০
বাংলাবাজার ০১৭৩০০০০৬৪৮
সিলেট ০১৭০৮৪৩৫৫৭৯

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

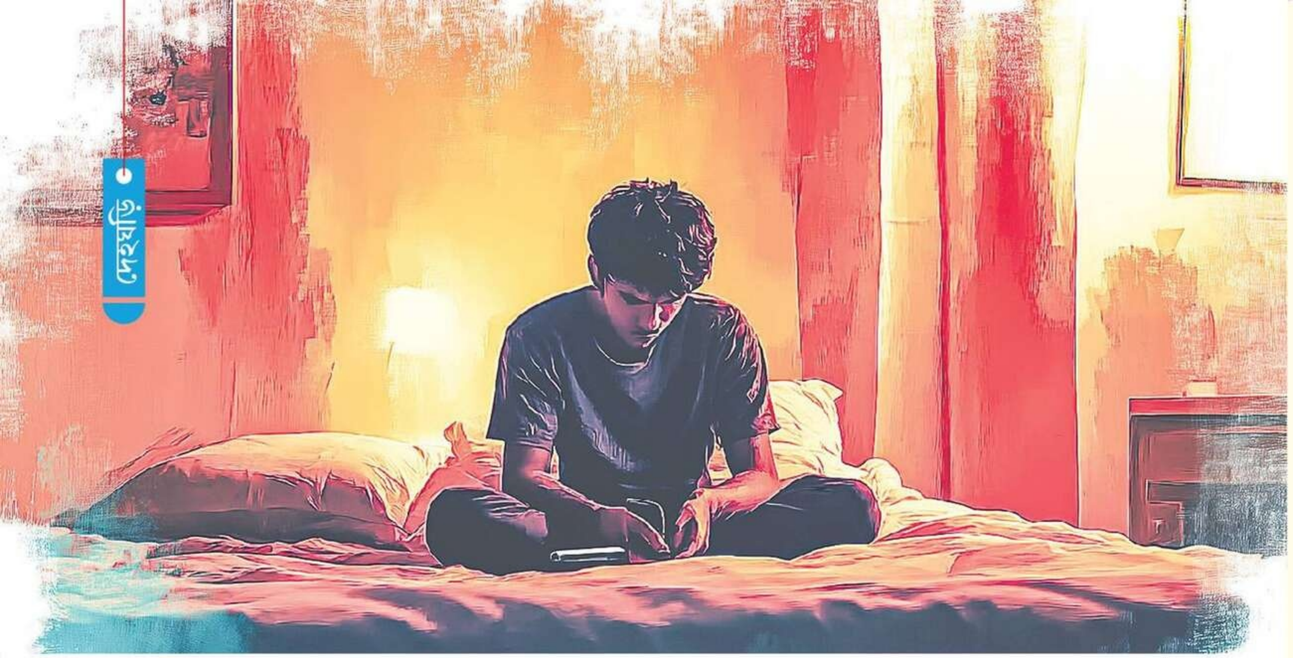

দেরিতে ঘুম, মস্তিষ্কের অপূরণীয় ক্ষতি

সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব কিশোর-তরুণ রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যান এবং বেশি সময় ঘুমান, তাঁদের মস্তিষ্ক বেশি সচল থাকে। ঘুম ভালো হলে মস্তিষ্কও ভালো কাজ করে। বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক পরীক্ষায় তাঁরা ভালো নম্বরও পান। এই গবেষণার বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের *সেল রিপোর্টস* জার্নালে।

তিন হাজারের বেশি শিক্ষার্থীকে নিয়ে এই গবেষণা করা হয়। তাতে দেখা গেছে, যাঁরা রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়েছেন, বেশি সময় ঘুমিয়েছেন এবং ঘুমের সময় যাঁদের হৃৎস্পন্দন (হার্টবিট) কম ছিল, তাঁরা পড়াশোনায় সবচেয়ে ভালো করেছেন। সমস্যা সমাধান আর যুক্তি দিয়ে চিন্তা করার মতো পরীক্ষাগুলোতে বাকিদের পেছনে ফেলেছেন তাঁরা।

গবেষকেরা দেখেছেন, ঘুমের সামান্য পার্থক্যও মানুষের মস্তিষ্কে অনেক প্রভাব ফেলে। এই গবেষণা দলের অন্যতম প্রধান বিজ্ঞানী কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল নিউরোসাইকোলজির অধ্যাপক বারবারা সাহাকিয়ান। তিনি বলেন, 'আমরা ঘুমের সময় স্মৃতি সংরক্ষণ করি। তাই ঘুম ভালো হলে স্মৃতিশক্তি ভালো থাকে, মস্তিষ্ক ভালোভাবে কাজ করতে পারে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ঘুমে সামান্য পরিবর্তন হলেও তার প্রভাব অনেক বেশি হয়।'

ভালো ঘুম হলে যে সারা দিন শরীর ফুরফুরে লাগে, তা আমরা জানি। কিন্তু গবেষকেরা একটা নতুন বিষয় জানার চেষ্টা করেছেন। কিশোর বয়সে মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ হয়। একই সময়ে কিশোরদের মধ্যে রাত জেগে থাকার প্রবণতাও বাড়ে। এ সময়ে ওদের মস্তিষ্কে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে, তা জানা ছিল না গবেষকদের। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তাঁরা এই পরীক্ষা করেছেন।

এই গবেষণায় যেসব শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের মস্তিষ্ক স্ক্যান করা হয়েছিল। তারপর তাঁদের নানা রকম মানসিক দক্ষতার পরীক্ষা নেওয়া হয়। পাশাপাশি ফিটবিটের মাধ্যমে তাঁদের ঘুমের হিসাব রাখা হয়। মোট তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয় তাঁদের। প্রথম দল সবচেয়ে দেরিতে ঘুমাতে যেত এবং সবচেয়ে সকালে ঘুম থেকে উঠত। এই গ্রুপে প্রায় ৩৯ শতাংশ শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁরা প্রতি রাতে গড়ে ৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট ঘুমাতেন। দ্বিতীয় দলের প্রায় ২৪ শতাংশ শিক্ষার্থী গড়ে ৭ ঘণ্টা ২১ মিনিট ঘুমাতেন। আর তৃতীয় দলের ৩৭ শতাংশ শিক্ষার্থী ঘুমাতেন সবচেয়ে তাড়াতাড়ি। তাঁরা সবচেয়ে বেশি সময়ও ঘুমাতেন এবং ঘুমের সময় তাঁদের হৃৎস্পন্দন ছিল সবচেয়ে কম। তাঁরা গড়ে প্রায় ৭ ঘণ্টা ২৫ মিনিট ঘুমিয়েছেন।

যদিও এই তিন দলের পড়াশোনার ফলাফলে তেমন কোনো বড় পার্থক্য দেখা যায়নি। তবে তৃতীয় দলটি বুদ্ধির পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে। এরপর দ্বিতীয় দল, আর সবচেয়ে খারাপ করেছে প্রথম দল। অর্থাৎ, যাঁরা সবচেয়ে দেরিতে এবং কম সময় ঘুমিয়েছেন, তাঁরা। মস্তিষ্কের স্ক্যানে দেখা গেছে, তৃতীয় দলের মস্তিষ্কের আকার সবচেয়ে বড় ছিল। তাঁদের মস্তিষ্কের কার্যক্রমও ছিল সবচেয়ে ভালো।

অধ্যাপক সাহাকিয়ান বলেন, 'ঘুমের সামান্য পার্থক্য যে এত বড় প্রভাব ফেলেছে, তা দেখে আমরা অবাক হয়েছি। প্রতিটি দলের মধ্যে ঘুমের পার্থক্য কয়েক মিনিটের। কিন্তু প্রভাবটা অনেক বেশি।'

তবে শুধু গবেষণা করেই থামেননি অধ্যাপক সাহাকিয়ান। যে কিশোরেরা ভালোভাবে ঘুমাতে চায়, তাদের তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করার পরামর্শ দিয়েছেন। বেশি রাতে মোবাইল ও কম্পিউটার ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

শিক্ষার্থীদের ঘুমের একটা সাধারণ সমস্যা আছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা বর্তমানে সপ্তাহে পাঁচ-ছয় দিন স্কুলে যায়। স্কুলের দিন ওদের খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয়। আর ছুটির দিনে ওরা বেশি সময় ঘুমায়। এতে ঘুমের চক্র নষ্ট হতে পারে। আবার ছুটির আগের দিন রাতে অনেকেই দেরি করে ঘুমায়। এতে ঘুমের সমস্যা হয়। যথেষ্ট সময় ঘুম হয় না, হলেও তা গভীর হয় না। আমেরিকান একাডেমি অব স্লিপ মেডিসিন অনুসারে, ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের প্রতি রাতে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত।

যুক্তরাজ্যের ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক গ্যারেথ গ্যাসকেলের মতে, 'এই গবেষণায় বয়ঃসন্ধিকালের শুরুর দিকে আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত। কিশোর-কিশোরীদের ঘুম নিয়ে আরও গবেষণা দেখতে চাই, যাতে ওদের সাহায্য করা যায়।'

বিজ্ঞানচিন্তা ডেস্ক
সূত্র : *দ্য গার্ডিয়ান*

বুদ্ধি ব্যায়াম

একজন কৃষককে জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁর খামারে কয়টি পশু আছে? কৃষক বললেন, 'আমার খামারে শুধু ভেড়া, ছাগল আর ঘোড়া আছে। এই মুহূর্তে তিনটি ছাড়া বাকি সব ভেড়া, চারটি ছাড়া বাকি সব ছাগল আর পাঁচটি ছাড়া বাকি সব ঘোড়া।'
এখন প্রশ্ন হলো, তাঁর খামারে কোন প্রাণী কয়টা আছে?

সাহারার দাদির কাছে কিছু টাকা আছে। তিনি তাঁর নাতনিকে সেই টাকার অর্ধেক দিলেন। আর নাতিকে দিলেন নাতনির অর্ধেক। নিজের ভাইকে দিলেন মোট টাকার ছয় ভাগের এক ভাগ। আর বাকি এক হাজার রাখলেন নিজের কাছে। তাহলে সাহারার দাদির কাছে মোট কত টাকা ছিল?

যাদব ও মাধব যমজ ভাই। তারা একজন অন্যজনের বাড়ির উল্টো পাশে থাকে। তাদের দুজনের বাসা নম্বরও উল্টো। দুজনের বাড়ির নম্বরের পার্থক্য এমন একটা সংখ্যা, যার শেষে দুই আছে। তাহলে এই দুই ভাইয়ের বাড়ির নম্বরের সবচেয়ে ছোট সংখ্যাগুলো কত হতে পারে?

একটা তাসের পুরো প্যাকেট থেকে অল্প কিছু তাস হারিয়ে গেছে। যদি চারজনের মধ্যে তাসগুলো ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে তিনটি তাস বেঁচে যায়। যদি তিনজনের মধ্যে ভাগ করে দেয়, তাহলে দুটি তাস থাকে। আর যদি পাঁচজনের মধ্যে ভাগ করে দেয়, তাহলে দুটি তাস থাকে। তাহলে ওই প্যাকেটে মোট কতগুলো তাস ছিল?

সমাধান পাঠিয়ে জিতে নিন পুরস্কার!

একটি কাগজে বড় করে লিখুন 'বুদ্ধির ব্যায়াম', তারপর উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন। খামের ওপর বড় করে লিখতে হবে 'বুদ্ধির ব্যায়াম', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে দৈবচয়নে তিনজন পাবেন বিশেষ পুরস্কার! উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ মে ২০২৫।

উত্তর পাঠান : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

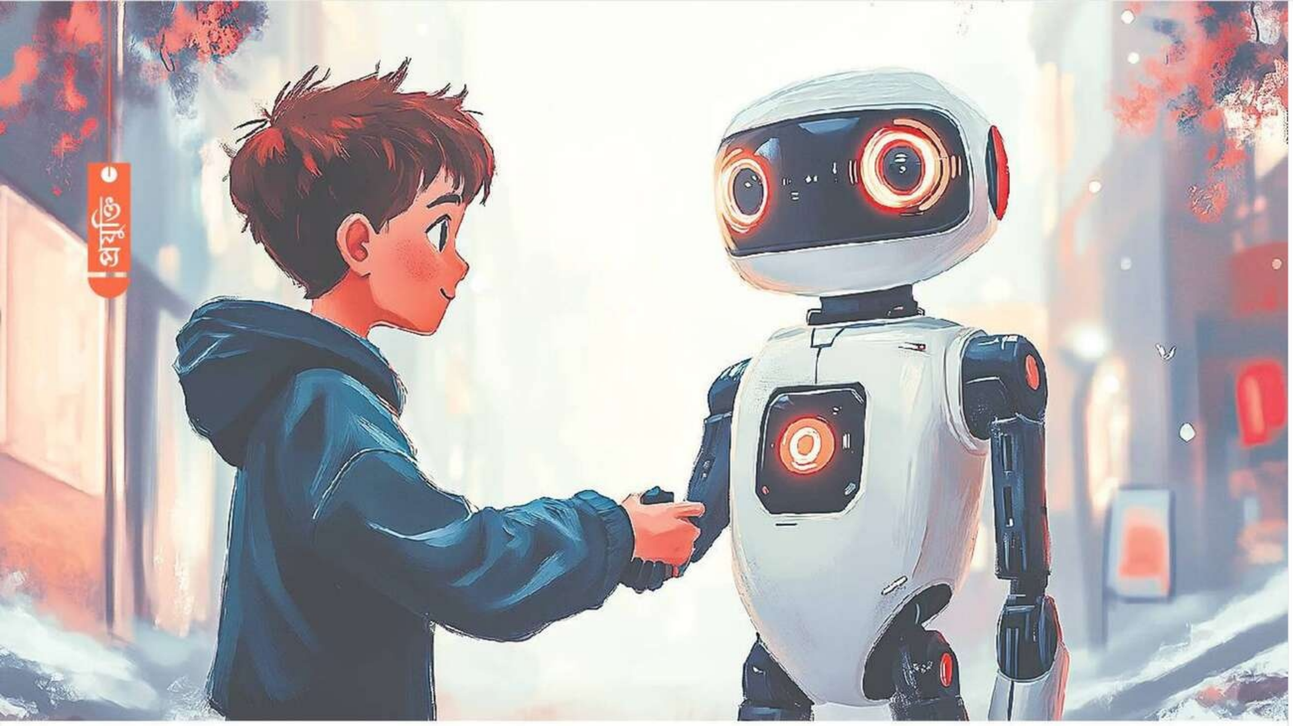

ধন্যবাদ চ্যাটজিপিটি, লাভ-ক্ষতির খতিয়ান

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

ওপেনএআইয়ের সিইও স্যাম অল্টম্যান বলেছেন, জিপিটিকে মানুষ ধন্যবাদ দেওয়ার ফলে অপচয় হচ্ছে লাখো-কোটি ডলার। আসলেই কি তাই?

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

তোমাকে, অর্থাৎ জিপিটি মডেলকে ধন্যবাদ দিলে সত্যিই কি লাখো কোটি ডলার অপচয় হয়?

চ্যাটজিপিটিকেই জিজ্ঞেস করলাম কথাটা। ১৯ এপ্রিল ওপেনএআইয়ের সিইও স্যাম অল্টম্যান এ কথাই বলেছেন। 'টেনস অব মিলিয়নস অব ডলার' মানে তো সেই লাখো-কোটিই। জিপিটি কী উত্তর দিল? বলল, 'হ্যাঁ, জিপিটিকে "ধন্যবাদ" বললে বাড়তি "টোকেন" লাগে, ফলে খানিকটা বেশি কম্পিউটেশনাল রিসোর্স এবং শক্তি ব্যয় হয়।'

তাই বলে এআইয়ের সঙ্গে ভদ্র আচরণ এড়ানো উচিত নয়। ভদ্রতা এআইয়ের আচরণকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। ফলে এআই আরও গোছানো উত্তর দেয়, সহায়ক আচরণ করে।

এবার একটু কনফিউজড হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। এআইয়ের কাছ থেকে সহায়ক আচরণ ও গোছানো উত্তরই তো চাই। তাহলে এআইকে ধন্যবাদ দেব, নাকি দেব না?

সে জন্য চলুন, বিষয়টির গভীরে একটু উঁকি দেওয়া যাক। খতিয়ে দেখা যাক, ধন্যবাদ বললে যে বাড়তি শক্তি ও 'টোকেন' ব্যয় হচ্ছে, সেটা কেন, কীভাবে হচ্ছে। জানা যাক, ধন্যবাদ বললে ব্যবহারকারীর আসলেই লাভ আছে কি না।

২

'এআই দিয়ে এখন কী করা হচ্ছে'—এমন প্রশ্ন করা এখন অর্থহীন। প্রশ্নটা উল্টে গেছে। এখন জিজ্ঞেস করতে হবে, 'এআই দিয়ে কী করা হচ্ছে না?' নোবেলজয়ী গবেষণা যেমন করা হচ্ছে, মহাকাশে গ্রহ-নক্ষত্র শনাক্তের কাজে যেমন ব্যবহৃত হচ্ছে, তেমনি রিপোর্ট লেখা থেকে শুরু করে গাড়ির নষ্ট ইঞ্জিন কতটা নষ্ট, তা বিশ্লেষণের কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে এআই। এবং এসব কাজের অনেকগুলো এখন সাধারণ মানুষ, অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নন, এমন যে কেউ চটজলদি করে ফেলতে পারছেন।

আমাদের বাস্তবতা বদলে গেছে, আমরা বুঝতেই পারিনি। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে এআইয়ের 'গোছানো উত্তর' অত্যন্ত জরুরি। তাহলে শুরুর সেই প্রশ্নটা—চ্যাটজিপিটিকে মানুষ যে ধন্যবাদ দেন, তা মানবিক বৈশিষ্ট্য, অভ্যাস ও ভদ্রতাবোধের জন্য তো বটেই; কিন্তু এটি কি এআইয়ের জবাবকে প্রভাবিত করে? প্রশ্নটা যদি উল্টোভাবে বলি, যদি কেউ এআইয়ের সঙ্গে অভদ্রতা করেন, সে ক্ষেত্রে এআই কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে? এ কথাটাই জিজ্ঞেস করলাম চ্যাটজিপিটিকে।

'তোমার নিজস্ব ডেটাবেজ খুঁজে দেখো, নিজের প্রতিক্রিয়া যাচাই করো এবং বলো—কেউ ভদ্রতা করলে, অভদ্র আচরণ করলে এবং নিরপেক্ষ আচরণ করলে তোমার অ্যালগরিদম (জিপিটি ৪ মডেল) কেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়?'

জিপিটির উত্তর—জিপিটির চেতনা নেই, তবে তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে মানুষের ভাষা এবং নানা ধরনের মিথস্ক্রিয়ার (আচরণ) প্যাটার্ন দিয়ে। ফলে এটি সত্যিই কিছু 'অনুভব' করে না, তবে ব্যবহারকারীর আচরণের ওপর ভিত্তি করে জিপিটির আচরণ ভিন্ন হয়।

১. **ভদ্রতা :** এ ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী 'প্লিজ' বা 'থ্যাংক ইউ' বলেন, ভদ্রস্বরে প্রশ্ন করেন। জিপিটির উত্তর এ ক্ষেত্রে বিস্তারিত, গোছানো ও যথাসম্ভব সহায়ক হয়। যেহেতু জিপিটির প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত তথ্যে মানুষের ভদ্র আচরণ শেখানো হয়েছে, এ ক্ষেত্রে জিপিটি দীর্ঘ এবং সুচিন্তিত প্রতিক্রিয়া দেখায়। আবার কিছু মডেলের ক্ষেত্রে 'আরএলএইচএফ' নামে একধরনের অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয়। এর পূর্ণরূপ, লার্ন ফ্রম হিউম্যান ফিডব্যাক (RLHF)। অর্থাৎ ব্যবহারকারীর আচরণ থেকে এআই শেখে। এ ক্ষেত্রে এককথায় বললে, ভদ্র আচরণ মানেই বেস্ট আউটপুট।

২. **অভদ্রতা বা রূঢ় আচরণ :** ব্যবহারকারী এ ক্ষেত্রে গালি দেন, আগ্রাসন দেখান, শিগগিরই কাজ করতে বলেন (ডু দিস নাউ)। এসব ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত অভদ্রতা বা গালি দিলে জিপিটি উত্তর দেয় না, 'সেফটি মেকানিজম' ট্রিগার করে। মাত্রাতিরিক্ত না হলে এটি উত্তর দেয় মেপে মেপে (ফলে উত্তর অতটা গোছানো হয় না)।

৩. **নিরপেক্ষ আচরণ :** এ ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী ভালো বা খারাপ ব্যবহার করে না। জিপিটিও তখন সোজাসাপটা উত্তর দেয়, বাড়তি কিছু করার চেষ্টা করে না।

সঙ্গে 'লেজ' হিসেবে জিপিটি জুড়ে দিয়েছে, 'তবে তবু যদি কাটা কাটা কথা বলো, তবু আমি যথাসম্ভব ভালোভাবেই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।'

খুব খুলে না বললেও পাঠক হয়তো বুঝতেই পারছেন, সেরা আউটপুট পাওয়া যায় ভদ্রভাবে প্রশ্ন করার ফলেই। তবে নিরপেক্ষ আচরণও মন্দ আউটপুট দেয় না, যদিও তা হয়তো 'বেস্ট' হবে না।

৩.

এবার ক্ষতির খতিয়ান। এ জন্য জিপিটি বা এআই মডেলগুলোর কার্যপদ্ধতির ভেতরের বিষয়গুলো হালকাভাবে জানা প্রয়োজন। যেকোনো বাক্যকে এআই মডেলগুলো 'টোকেন'-এ রূপান্তর করে। কম্পিউটার যেমন যেকোনো কিছুকে বাইনারি তথা ০ ও ১-এ রূপান্তর করে, সে রকম জিপিটির মতো এআই মডেলগুলোর ব্যবহৃত একক হলো টোকেন। সহজ করে বললে, প্রতিটি শব্দকে একটা টোকেন ভাবতে পারেন, আবার যতিচিহ্নগুলো আলাদা টোকেন—এ রকম। বাঁ থেকে ডানে টোকেন ধরে ধরে স্ক্যান করে জিপিটি, সেখান থেকে টোকেন বা শব্দ ধরে সার্চ করে নিজস্ব ডেটাবেজে—ব্যবহারকারী কোনো লিংক দিয়ে দিলে সেগুলোতেও ঢুঁ দিতে পারে—তারপর সে অনুযায়ী উত্তরটা খুঁজে বের করে টোকেন বা শব্দের পর শব্দ জুড়ে দিয়ে উত্তর দেয়।

ঘটনা অবশ্যই এত সরল নয়, সরলীকরণ করে বলা হচ্ছে একটা সাধারণ ধারণা দিতে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রতি সপ্তাহে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করেন প্রায় ৪০ কোটি ব্যবহারকারী। প্রত্যেকে প্রতিটি আলাপে এক-দুটি করে বাড়তি টোকেন ব্যবহার করলে কী পরিমাণ বাড়তি রূপান্তর, সার্চ, যাচাই ইত্যাদি জিপিটিকে করতে হয়, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

এই যে কম্পিউটেশন করা, এ জন্য চ্যাটজিপিটির প্রসেসরগুলোর বিদ্যুৎশক্তি দরকার পড়ে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম *ওয়াশিংটন পোস্ট* যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে এ নিয়ে একটা গবেষণা করেছে। তাদের এক রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, ১০০ শব্দের ই-মেইল জেনারেট করতে এআইয়ের প্রায় ১৪ কিলোওয়াট-ঘণ্টার সমতুল্য বিদ্যুৎ লাগে। এ পরিমাণ বিদ্যুৎ দিয়ে ১৪টা এলইডি বাতি এক ঘণ্টা করে জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব। এটা মাত্র ১০০ শব্দের হিসাব, বাকিটা একটু থেমে কল্পনা করার চেষ্টা করুন।

ই-মেইল বাদ দিয়ে ভদ্রতার কাজে ব্যবহৃত বাড়তি টোকেনের একদম গড়পড়তা একটা হিসাব যদি করি, সাধারণভাবে বললে, সাধারণ গুগল সার্চের তুলনায় প্রতি চ্যাটে এই 'থ্যাংক ইউ' প্রসেস করতে জিপিটির মোটামুটি ১০ গুণ শক্তি ব্যয় হয়। তাতে এক বছরে পড়ে যায় প্রায় ১.০৫৯ বিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ। এটাকে মোটামুটি বছরে ১৩৯.৭ মিলিয়ন বা প্রায় ১৪ কোটি মার্কিন ডলার বলা যেতে পারে। এই হিসাব পাওয়া যাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া-নির্ভর আইটি কোম্পানি টেকভারএক্সের লিংকড-ইন পোস্টে।

শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, এসব প্রসেসর শীতল রাখার জন্য পানির খরচ আছে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎপাদনের ব্যাপার আছে, আছে আরও অনেক কিছু। একবার 'ধন্যবাদ' বলতে গিয়ে এত কিছু কি আমাদের মাথায় থাকে?

স্যাম অল্টম্যানের কথাটা যে মিথ্যা নয়, তা তো বুঝতেই পারছেন। তাহলে জিপিটিকে কি ধন্যবাদ দেবেন? নাকি নিরপেক্ষ স্বরে কাটকাটভাবে জানতে চাইবেন?

এ প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই জানেন। আলাদা করে কিছু বলার আসলে প্রয়োজন নেই।

লেখক : সহসম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা

সূত্র : ফিউচারিজম, ওয়াশিংটন পোস্ট, সাভাসল্যাবস, টেকভারএক্স, চ্যাটজিপিটি

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

ব্লুটুথ যেভাবে কাজ করে

এক নর্ডিক রাজা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং রেডিও শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে এই তারহীন সংযোগ আমাদের ইলেকট্রনিক ইকোসিস্টেম গড়ে তুলেছে, তার সাতসতেরো জেনে নিন।

ব্লুটুথ প্রযুক্তির মাধ্যমে তারহীন হেডফোনের বা ব্লুটুথ ইয়ারবাডের বিপ্লব ঘটেছে।

আপনি যদি এই মুহূর্তে কোনো ঘরে থাকেন, সম্ভাবনা আছে চারপাশে তাকালে অন্তত হাফ ডজন বৈদ্যুতিক যন্ত্র দেখতে পাবেন। কিন্তু ভাবুন তো, এই সব কটি যন্ত্র যদি তার দিয়ে যুক্ত হয়, তাহলে কেমন হবে? স্মার্টফোন থেকে স্পিকার—সব ইলেকট্রনিক ডিভাইস তার দিয়ে যুক্ত। ঘরের মেঝে তারের জঞ্জালে ভরা। চলাফেরা করা কঠিন। গেম কনসোল থেকে গেম কন্ট্রোলার পর্যন্ত তারের সংযোগ দেওয়া। এ রকম হলে ক্রিনের কয়েক গিটারের মধ্যে বসে গেম খেলতে হবে আপনাকে। তার দিয়ে যুক্ত ইলেকট্রনিকসের এই জগৎ শুধু অগোছালোই হবে না, বরং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঝুঁকিও তৈরি হবে। এই সমস্যার সমাধানে আবির্ভাব হয় ব্লুটুথ প্রযুক্তির। আমরা সবাই এর নাম শুনেছি, হয়তো ব্যবহারও করেছি। কিন্তু ব্লুটুথ আসলে কী?

আধুনিক গাড়িগুলোয় ব্লুটুথ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়, যাতে ফোনের জিপিএস ও মিউজিক প্লেয়ারের মতো ফিচারগুলো ব্যবহার করা যায়।

মোবাইল ডিভাইসে যে আইকনিক ব্লুটুথ চিহ্নটি দেখা যায়, তা নর্ডিকের রাজা হ্যারাল্ড ব্লুটুথের নামের শুরু দুটি অক্ষর।

১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে প্রথম উদ্ভাবিত হয় এই প্রযুক্তি

অল্প দূরত্বে ইলেকট্রনিক ডিভাইসে তারহীন যোগাযোগের একটি পদ্ধতি হলো ব্লুটুথ, যা রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে। *নেচার ইলেকট্রনিকস জার্নাল*-এর মতে, ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে প্রথম উদ্ভাবিত হয় এই প্রযুক্তি। বৈদ্যুতিক ডিভাইসগুলোকে তার দিয়ে যুক্ত করার ঝামেলা ছাড়াই অনেকগুলো ডিভাইসকে সংযোগ দেওয়ার সমস্যার সমাধান হিসেবে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ব্লুটুথ।

এখন অনেকে ভাবতে পারেন, ব্লুটুথ আর এমন কী? কেননা, রিমোট দিয়ে তো টিভি চ্যানেল পরিবর্তন করাই যায়। আর এই অদৃশ্য সংকেত তো অনেক আগে থেকেই ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে রিমোট কন্ট্রোল যেগুলো ইনফ্রারেড সংকেত ব্যবহার করে, সেগুলো টিভির সামনে রাখতে হয়। ট্রান্সমিটার ও রিসিভারের মধ্যে কোনো বাধা পেলে এটি আর কাজ করে না।

ব্লুটুথ রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে বলে এখানে আর বাধা পাওয়ার কোনো সমস্যা নেই। তবে এর পরিসর তুলনামূলকভাবে কম, প্রায় ১০ মিটারের মধ্যে। ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে উদ্ভাবনের পর থেকে এই প্রযুক্তি আরও উন্নত হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০২০ সালে প্রায় ৪০০ কোটি ডিভাইসে ব্লুটুথ সংযোগ দেওয়া হয়েছিল।

ব্রডকাস্টিং ব্যান্ডউইডথ

ব্লুটুথ হেডসেট বহুল পরিচিত ডিভাইস হয়ে উঠেছে

ব্লুটুথের মূল রহস্য হলো পুরোনো ধাঁচের রেডিও। তবে ঠিক যেমনটা আমরা জানি, তেমনটা নয়। সম্প্রচারের জন্য বা মোবাইলের সংকেত পাঠানোর জন্য যখন রেডিও ব্যবহার করা হয়, তখন এর প্রধান কাজ হলো দূরত্ব অতিক্রম করা। কারণ, একটি রেডিও স্টেশন চায় তার সম্প্রচার যেন দূরদূরান্তে শোনা যায়। অন্যদিকে মোবাইলের সংকেত খোঁজে কাছে থাকা মোবাইল টাওয়ারের, তা থেকে সংকেত পাঠায় গ্রহণকারীর মোবাইলে।

ব্লুটুথ কিন্তু এর চেয়ে অনেক কম শক্তিশালী। এটির পরিসীমা মাত্র ৩০ ফুট বা ১০ মিটার। রেডিও স্পেকট্রাম ৩ হার্জ থেকে ৩ হাজার গিগাহার্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। ফ্রিকোয়েন্সি যত কম হবে, পরিসীমা হবে তত বেশি। তবে ডেটা পাঠানো ও গ্রহণের হার এবং মানও কম হবে। ব্লুটুথ ২.৪ গিগাহার্জে কাজ করে। ফলে এটির পরিসীমা ও ডেটার মানের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য থাকে। এই ফ্রিকোয়েন্সির আরেকটি সুবিধা হলো, এটি বিশ্বের সব দেশে সহজে পাওয়া যায়। এ কারণে ব্লুটুথ তারহীন সংযোগের এক আদর্শ মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

ইকোসিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত

ব্লুটুথ রেডিও সংকেতের একটি জটিল ওয়েব দিয়ে তৈরি

১. স্লেভ
যে ডিভাইস ব্লুটুথ সংকেত গ্রহণ করে, তাকে 'স্লেভ' বলে।

২. সিনক্রোনাইজেশন
যোগাযোগের জন্য দুটি ব্লুটুথ ডিভাইসকে একে অপরের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে যুক্ত হতে হয়।

৩. মাস্টার
যে ডিভাইস অন্য ডিভাইসের সঙ্গে ব্লুটুথ সংযোগ স্থাপন করে, তাকে 'মাস্টার' বলে।

৪. পিকোনেট
ছোট নেটওয়ার্কে কমপক্ষে দুটি ডিভাইস থাকে। যখন দুটি পিকোনেট একটি ডিভাইসের মাধ্যমে যুক্ত হয়, তখন তাকে 'স্ক্যাটারনেট' বলে।

৫. রেডিও সংকেত
কম শক্তির রেডিও সংকেত পাঠানো ও গ্রহণ করা হয়।

৬. বিল্ট-ইন চিপস
ব্লুটুথ চলতে পারে, এমন ডিভাইসে সংকেত পাঠানো ও গ্রহণ করার জন্য একটি চিপ থাকে।

সতর্কতা
বহুল পরিচিত ব্লুটুথ ডিভাইস ইয়ারবাড বা ব্লুটুথ হেডসেট দীর্ঘসময় কানে দিয়ে রাখলে শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে

জানেন কি?
সিগের সদস্যসংখ্যা ৩৬ হাজারের বেশি।

ব্লুটুথ

ব্লুটুথের সূচনা ১৯৯০-এর দশকে। সুইডিশ মোবাইল এরিকসনের জাপ হার্টসেন এটি উদ্ভাবন করেন। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে ব্লুটুথ স্পেশাল ইন্টারেস্ট গ্রুপ (SIG) গঠিত হলে এর উন্নয়ন ও প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতে ব্লুটুথের পরিচিত বিশ্বব্যাপী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। গ্রুপটি ১৯৯৯ সালে ব্লুটুথ ১.০ প্রকাশ করে এবং এক বছর পর এটি মোবাইল ফোন ও ডেস্কটপ কম্পিউটারে ব্যবহার শুরু হয়। ২০০১ সালে এটি ল্যাপটপ ও প্রিন্টারেও জায়গা করে নেয়। এই দশকের মাঝামাঝি সময়ে ব্লুটুথ হেডসেট বা এয়ারপডের কথা বলার দারুণ ফিচারের জন্য সবার কাছে এটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

হাউ ইট ওয়ার্কস অবলম্বনে **আসহাবিল ইয়ামিন**

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

প্রজেক্ট

মজার হবি ইলেকট্রনিকস

বৈদ্যুতিক সার্কিট বানাতে কিছু উপাদান লাগে। এই উপাদানগুলো সার্কিটের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। প্রজেক্ট বানাতেও নানা ধরনের উপাদান ব্যবহার করতে হয়। উপাদানগুলো কী, কীভাবে কাজ করে এবং কেনার সময় কী কী দেখতে হবে, সেটা জানা জরুরি।

এ কারণেই প্রজেক্টের খুঁটিনাটি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হবে বিজ্ঞানচিন্তায়। ধাপে ধাপে শেখানো হবে, কীভাবে প্রজেক্ট তৈরি করতে হয়। তারপর তুমি নিজেই বানাতে পারবে নানা রকম প্রজেক্ট।

সোলার প্যানেল নানা আকার ও আকৃতির পাওয়া যায়। সার্কিটে এদের কাজ কী, তা মাথায় রেখে সোলার প্যানেল বেছে নিতে হবে।

সরাসরি সূর্যের আলো বা হ্যালোজেন লাইটের আলো সোলার প্যানেলের ওপর পড়লে সবচেয়ে ভালো কাজ করে।

ছোট আকারের সোলার প্যানেল—

বিদ্যুতের উৎস

সার্কিটে বিদ্যুৎ দেওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ব্যাটারি ব্যবহার করা। ব্যাটারির ভেতরে রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে ইলেকট্রন তৈরি হয়। আর এই ইলেকট্রনগুলো সার্কিটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এ ছাড়া আমরা সোলার প্যানেল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারি। বিদ্যুতের একক হলো ভোল্ট (V)।

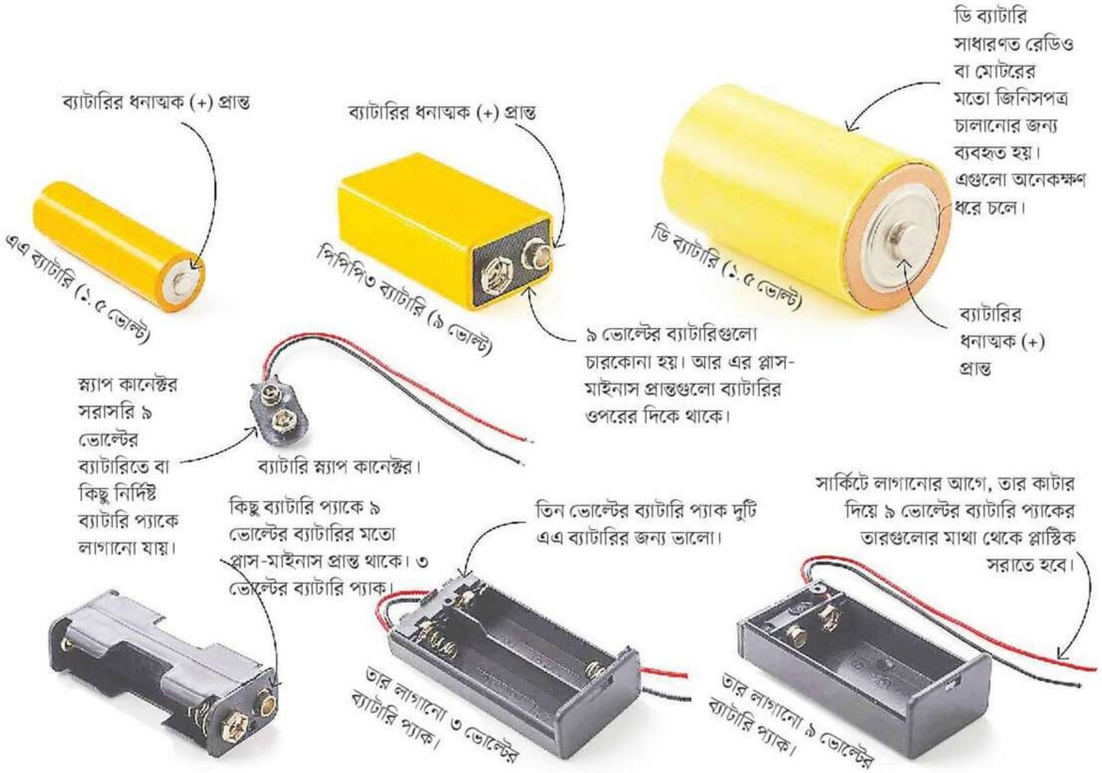

ক্যাপাসিটর

ক্যাপাসিটর বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখতে পারে। যখন সার্কিটে বিদ্যুৎ চলাচল শুরু হয়, তখন ক্যাপাসিটর চার্জ হতে থাকে। পুরোপুরি চার্জ হয়ে গেলে এর মধ্য দিয়ে আর বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না। ক্যাপাসিটরের একক ফ্যারাড (F)। বেশির ভাগ ক্যাপাসিটর খুব অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ সঞ্চয় করতে পারে। তাই এদের সাধারণত মাইক্রোফ্যারাড (μF), ন্যানোফ্যারাড (nF) বা পিকোফ্যারাডের (pF) মতো ছোট একক দিয়ে মাপা হয়।

এই ক্যাপাসিটরের মাঝের নব ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমানো-বাড়ানো যায়।

পরিবর্তনশীল টিউনিং ক্যাপাসিটর।

ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের গায়ে প্লাস (+) বা মাইনাস (-) চিহ্ন থাকে, তাই সার্কিটে লাগানোর সময় এটা খেয়াল রাখতে হয়।

বেশির ভাগ ক্যাপাসিটর সিরামিকের তৈরি, আর এগুলো সাধারণত কমলা রঙের হয়।

ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের একটা পা (প্লাস পা) অন্যটার চেয়ে লম্বা থাকে।

০.১ μF (১০০ nF) ক্যাপাসিটর।

০.০১ μF (১০ nF) ক্যাপাসিটর।

১০ μF ক্যাপাসিটর।

২.২ μF ক্যাপাসিটর।

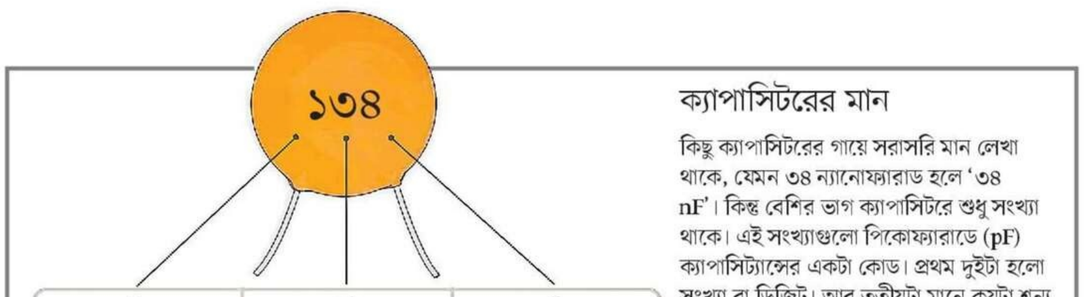

ক্যাপাসিটরের মান

কিছু ক্যাপাসিটরের গায়ে সরাসরি মান লেখা থাকে, যেমন ৩৪ ন্যানোফ্যারাড হলে '৩৪ nF'। কিন্তু বেশির ভাগ ক্যাপাসিটরে শুধু সংখ্যা থাকে। এই সংখ্যাগুলো পিকোফ্যারাডে (pF) ক্যাপাসিট্যান্সের একটা কোড। প্রথম দুইটা হলো সংখ্যা বা ডিজিট। আর তৃতীয়টা মানে কয়টা শূন্য যোগ করতে হবে। ন্যানোফ্যারাডে নিতে হলে ১০০০ দিয়ে ভাগ করতে হবে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। যদি ক্যাপাসিটরের গায়ে ১০৪ লেখা থাকে, তাহলে এর মান হবে ১০, আর তারপর ৪ লেখা মানে ৪টা শূন্য হবে। অর্থাৎ ১০০,০০০ পিকোফ্যারাড। একে ১০০০ দিয়ে ভাগ করলে হবে ১০০ ন্যানোফ্যারাড।

টেক ল্যাব অবলম্বনে **কাজী আকাশ**

Job Solution BD
Click Here to join the Channel
Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

প্রাণিজগৎ

‘গেম অব থ্রোনস’-এর ডায়ার উলফ কি ফিরল

প্রায় সাড়ে ১২ হাজার বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ডায়ার উলফ ফিরিয়ে এনেছে মার্কিন কোম্পানি কলোসাল বায়োসায়েন্সেস। সত্যিই কি এত আগে বিলুপ্ত কোনো প্রাণী ফিরিয়ে আনা সম্ভব? এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন *নিউ সায়েন্টিস্ট*-এর পরিবেশবিষয়ক প্রতিবেদক মাইকেল লে পেজ। ম্যাগাজিনটির ২০২৫ সালের ১৯ এপ্রিল সংখ্যায় তিনি এ নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। পাঠকদের জন্য প্রবন্ধটির চুম্বক অংশ তুলে ধরা হলো।

Job Solution BD
Click Here to Join the Channel

কলোসাল কোম্পানি বলছে, তারা তিনটি ধূসর নেকড়ের শাবককে জেনেটিকভাবে বদলে ডায়ার উলফে পরিণত করেছে। এর দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলে উলফ বা নেকড়ে দুটির নাম রেমাস ও রোমুলাস। ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে এদের জন্ম। আর মেয়েটির নাম খালিসি। এটি জন্মেছে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে। (এই কোম্পানি কিছুদিন আগে লোমশ ইঁদুর ও তাসমানিয়ান টাইগারের জিনোম তৈরির কথাও ঘোষণা করেছে।)

এ আলোচনার শুরুতেই জানা প্রয়োজন, ডায়ার উলফ কী। এককালে ডায়ার উলফ নামে বিশালদেহী নেকড়ের এক প্রজাতি ছিল পৃথিবীতে। আজ থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এরা বাস করত। দেখতে অনেকটা বড় আকারের নেকড়ের মতো ছিল। পুরো শরীর ঢাকা ছিল সাদা লোমে। *গেম অব থ্রোনস* নামে জনপ্রিয় টিভি সিরিজে এদের দেখানো হয়েছিল। এ জন্য একটা নেকড়ের নাম রাখা হয়েছে খালিসি। এই সিরিজের একটা চরিত্রের নাম এটা।

তাহলে, প্রশ্ন করতে পারেন, ধূসর নেকড়ে আর ডায়ার উলফ কি এক জিনিস? উত্তর : না। অনেক দিন ধরে মনে করা হতো এরা কাছাকাছি গোত্রের আত্মীয়। কিন্তু ২০২১ সালের এক ডিএনএ গবেষণায় দেখা গেছে, ডায়ার উলফ আর ধূসর নেকড়ে শেষবার একসঙ্গে ছিল প্রায় ৬০ লাখ বছর আগে! আসলে শিয়াল, আফ্রিকান বন্য কুকুর বা ধোল প্রজাতির কুকুর ধূসর নেকড়ের অনেক বেশি কাছের আত্মীয়, অন্তত ডায়ার উলফের চেয়ে বেশি।

ডায়ার উলফ কী, তা তো বোঝা গেল। এখন কথা হলো, কলোসাল কীভাবে ডায়ার উলফের জন্ম দিল? কলোসাল বলছে, তারা ধূসর নেকড়ের জিনে মোট ২০ জায়গায় পরিবর্তন করেছে। এর ৫টি করা হয়েছে শুধু লোমের রং হালকা করার জন্য, মানে ডায়ার উলফের এখন যে রং দেখা যাচ্ছে, তার জন্য। বাকি ১৫টি পরিবর্তন করা হয়েছে ডায়ার উলফের জিন দেখে, যাতে ছানাগুলোর আকার, পেশি আর কান একটু আলাদা হয়। অর্থাৎ, ধূসর নেকড়ে আর ডায়ার উলফের মধ্যে অনেক জিনগত পার্থক্য আছে।

কলোসাল কোম্পানির বেথ শাপিরো বলেছেন, তাঁদের দল ডায়ার উলফের পুরো জিনোম বের করেছে এবং খুব তাড়াতাড়ি সেটা সবাইকে জানাবে। এই দুটি প্রাণীর মধ্যে ঠিক কতটুকু বা কতগুলো পার্থক্য আছে, তা বলতে পারেননি শাপিরো। তবে তিনি জানিয়েছেন, দুটি প্রাণীর ডিএনএ ৯৯ দশমিক ৫ শতাংশ একই রকম। কিন্তু ধূসর নেকড়ের জিনোম প্রায় ২৪০ কোটি বেস পেয়ার লম্বা। এর মানে হলো, মাত্র শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ পার্থক্য থাকা মানেও এদের জিনোমের লাখ লাখ বেস পেয়ারে অমিল রয়েছে।

রেমাস ও রোমুলাস নামের দুই ডায়ার উলফ

তাহলে এই বাচ্চাগুলো কি আসল ডায়ার উলফ নয়? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে প্রজাতি বলতে আমরা কী বুঝি, তার ওপর। শাপিরো বলছেন, প্রজাতি বোঝার নানা উপায় আছে। কেউ বিবর্তনের ইতিহাস দেখে বলেন, আবার কেউ দেখেন প্রাণীটা দেখতে কেমন। কলোসাল বলছে, ‘দেখতে যেহেতু ডায়ার উলফের মতো লাগে, তাই সেটাকেই আমরা ডায়ার উলফ বলছি।’ কিন্তু বিজ্ঞানী মহলে এটা নিয়ে মতভেদ আছে।

শেষ করার আগে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সদ্য জন্ম নেওয়া এই নেকড়েছানাগুলোর ভবিষ্যৎ কী? এদের রাখা হয়েছে ৮০০ হেক্টর জায়গার একটা সংরক্ষিত এলাকায়। সেখানে বিজ্ঞানীরা এদের খেয়াল রাখছেন। তবে এদের প্রজননের মাধ্যমে নতুন ছানা পাওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। মানে এদের দিয়ে আর বংশবৃদ্ধি করানো হবে না।

শেষ কথা

পুরো বিষয়টা তাহলে কী দাঁড়াল? এককথায় বললে, ডায়ার উলফ এখনো ফিরে আসেনি। আসলে কখনোই হয়তো ফিরে আসবেও না।

কলোসাল কোম্পানি কিছু ধূসর নেকড়েছানার জিন পাল্টে তাদের দেখতে ডায়ার উলফের মতো বানানোর চেষ্টা করেছে। এটা নিঃসন্দেহে একটা সাহসী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, কিন্তু একে বিলুপ্ত প্রাণীকে ফিরিয়ে আনা বলা যাবে না। এটা ঠিক যে বিজ্ঞান আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে জিন বদলে প্রাণীর গঠন পাল্টানো সম্ভব। কিন্তু ডায়ার উলফের মতো একটা সম্পূর্ণ আলাদা প্রজাতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য হয়তো আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

বিজ্ঞানচিন্তা ডেস্ক
সূত্র : *নিউ সায়েন্টিস্ট*/ নো, দ্য ডায়ার উলফ ইজ নট ব্যাক

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

প্রাণিজগৎ

বনের পাখির খাদ্য ও পুষ্টি

কাজী আলিম-উজ-জামান

আমরা পুষ্টিবিদের সহায়তা নিয়ে খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করি। এভাবে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খান অনেকে। কিন্তু বনের পাখিরা কীভাবে পুষ্টি পায়? কী খায় এরা? প্রকৃতির এই অজানা গল্প...

খাবারের পুষ্টিমান নিয়ে আমরা কতই-না ভাবি। কোন খাবার খেলে সঠিক পুষ্টি মিলবে, কোনটা শরীরের জন্য ভালো, কোন খাবারের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বেশি—যতটা সম্ভব জানার ও বোঝার চেষ্টা করি। অনেকেই সে অনুযায়ী খাবার গ্রহণ করি।

কিন্তু প্রকৃতিতে এত পাখি, এরা কীভাবে খাদ্য সংস্থান করে, কীভাবে পুষ্টি নিশ্চিত করে, কোন খাবারের মাধ্যমে তাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হয়, কখনো ভেবেছি আমরা?

আমরা অনেকেই বাসায় পাখি পুষি। তাদের জন্য খাবার কিনি। বাটিতে করে খাবার খাঁচার ভেতর দিলে পাখিরা খেয়ে নেয়। আবার পোষা পাখি অসুস্থ হলে আমরা তার শরীরে ওষুধ দিই। এ ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই প্রাণিচিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শ করি। কিন্তু যে পাখি প্রকৃতিতে বাস করে, সে অসুস্থ হলে কে তার দেখভাল করে? কীভাবে নিরাময় হয় তার রোগ। বিষয়টি কি ভাবার নয়?

সে জন্য শুরুতে জানতে হবে, কোন পাখি কোন খাবার খায়? আমরা অনেকেই জানি, বেশির ভাগ পাখি পতঙ্গভুক। কীটপতঙ্গই এদের প্রধান খাদ্য। তবে অনেক পাখি আবার সর্বভুক, অর্থাৎ এরা সব খায়। কিছু পাখি মাছ খায়, কিছু প্রজাতির পাখি আবার শস্যদানা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ ও দেহের পুষ্টিসাধন করে।

এই লেখা যখন লিখছি, শুনছি পাখির ডাক। ঢাকায় আমার বাসার ছাদে কিছু গাছ আছে। এর মধ্যে মেহেদি ও বরইগাছটি বেশ বড়। ভোর হলেই চড়ুই পাখিরা এই গাছ দুটিতে বসে। লক্ষ করে দেখলাম, সারাক্ষণই পাখিরা খাবার খুঁজতে ব্যস্ত। কখনো পাতায় ঠোকর দিচ্ছে, কখনো পোকামাকড়ের সন্ধানে এ-ডাল থেকে ও-ডাল করে বেড়াচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের মতে, পাখিরা প্রকৃতিতে টিকে থাকার চিরাচরিত নিয়মেই গড়ে ওঠা খাদ্যাভ্যাস থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়। প্রকৃতির বেশির ভাগ পাখিই আমিষনির্ভর।

পাখিদের খাবার

আমাদের প্রকৃতিতে যে বুনো প্রজাতির হাঁস রয়েছে, সেগুলো মূলত জলজ আগাছা, শাকসবজি, কচি লতাপাতা, পোকামাকড়, ছোট মাছ ও শামুক খেয়ে জীবন ধারণ করে। তবে এদের বেশি পছন্দ শেওলা-শৈবাল। আবাসিক বুনোহাঁসের মধ্যে আছে সরালি, রাজসরালি, ঘরঘরি ও বালিহাঁস। আর পরিযায়ী বুনোহাঁসের মধ্যে পিয়াং হাঁস, গিরিয়া হাঁস, ল্যাঞ্জাহাঁস, পান্থামুখী, রাঙ্গামুড়ি, লালমুড়ি, বামুনিয়া, লালশির, নীলশির ও পাতারি হাঁসই প্রধান। কিছু হাঁস আবার শুধু মাছ খায়। যেমন সরুচঞ্চু হাঁস।

অন্যদিকে জলচর পাখির মধ্যে সৈকত পাখিরা উপকূলের সৈকত, নদী ও জলাশয়ের তীরে অথবা জোয়ার-ভাটার ডুবোচরে নরম কাদায় চঞ্চু ঢুকিয়ে খুদে শামুক, কাঁকড়া, পোকামাকড়, চিংড়িপোনা খুঁজে খুঁজে খায়। সৈকত পাখির মধ্যে আছে চাপাখি, মেটে জিরিয়া, চামচঠুঁটো চাপাখি, ডোরালেজ জৌরালি ইত্যাদি।

এ ছাড়া দেশি যেসব জলচর পাখি আছে, এর মধ্যে পানকৌড়ি, বক—এরা খায় ছোট মাছ ও ব্যাঙ। বকের মাছ ধরে খাওয়ার ধরনটা আমাদের অনেকেরই জানা ও দেখা। জলচর পাখির মধ্যে শামুকখোল খায় বিশেষ প্রজাতির আপেল শামুক ও ছোট মাছ।

এবার আসা যাক বনের পাখির কথায়। ঘুঘু, ময়না, টিয়া, মুনিয়া—এরা খায় শস্যদানা। আবার কিছু পাখি আছে পোকাভুক, যেমন শালিক। ঘাসবনের পাখিরা, যেমন ফুটকি, চুটকি, টেসিয়া, ফিদ্দা অথবা চেরালেজ, এরাও পোকা ধরে খায়। কাঠঠোকরা সাধারণত গাছে পাওয়া পোকামাকড় খায়।

প্যাঁচা, বাজপাখি, ইগল—সব কটিই শিকারি পাখি। প্যাঁচা ইঁদুর, মাছ, টিকটিকি ও ব্যাঙ শিকার করে। বাজপাখি শিকারের সন্ধানে বাতাসে উঁচুতে উড়ে বেড়ায় এবং ছোট প্রাণী, পাখি, টিকটিকি, সাপ ও পোকামাকড় শিকার করে। মাছমুরাল জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার নখ দিয়ে মাছ ধরে খায়। বনমোরগ আর রাজকীয় চেহারার মথুরা পাখি কেঁচো, পোকা খুঁজে ফেরে ঝরা পাতার নিচে।

প্রকৃতিতে কিছু পাখি ফলমূল খেয়ে বাঁচে। যেমন নানা প্রজাতির কবুতর আর হরিয়াল। কোনো কোনো পাখি আমিষ ও শর্করা—দুটোই খায়। ফলনির্ভর ধনেশ আর বড় ঠোঁটের টুকান পাখি সুযোগ পেলে ছোট পাখি বা বাদুড় ধরে খায়।

তারুয়া সমুদ্রসৈকতে খাবার মুখে মোহনচূড়া। ছবি : আ ন ম আমিনুর রহমান

টাঙ্গুয়ার হাওরে খাবার খেতে ব্যস্ত শামুকখোল পাখি। ছবি : আ ন ম আমিনুর রহমান

পাখির পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধক্ষমতা

প্রাণিবিজ্ঞানীরা বলছেন, যেসব পাখি পুষ্টিসাধন করে শস্যের মাধ্যমে, সেসব প্রজাতির পাখি তাদের ছানাদের খাদ্য হিসেবে সরবরাহ করে কীটপতঙ্গ। কারণ, পাখির বাচ্চাদের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রচুর প্রোটিন বা আমিষের প্রয়োজন হয়। সেই আমিষ আসে পোকামাকড় ও এদের শূককীট থেকে। খাদ্যের জোগানের ওপরও পাখির খাদ্যাভ্যাস নির্ভর করে। কিছু প্রজাতির পাখি আছে, যারা একেক ঋতুতে একেক রকম পুষ্টি আহরণ করে।

বিশিষ্ট প্রাণী-গবেষক অধ্যাপক মোহাম্মদ ফিরোজ জামান বিজ্ঞানচিন্তাকে বলেন, কিছু প্রজাতির পাখি এমন কিছু খাদ্য গ্রহণ করে, যা তাদের সাধারণ খাদ্যতালিকায় থাকে না। ওই ধরনের বিশেষ খাদ্যগুলো খেয়ে তারা বিশেষ ধরনের পুষ্টি পায়, ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার করে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় একে সেলফ মেডিকেশন বলা হয়। পাখিসহ যেকোনো প্রাণী খাদ্য থেকে যেমন পুষ্টি সংগ্রহ করে, তেমনি ওষুধ হিসেবেও গ্রহণ করে। এটি পাখি প্রজাতির জীবনধারণের কৌশল।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, খাদ্যাভ্যাসের ওপর ভিত্তি করেই পাখিরা নানা রকম প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ করে। এটিও প্রকৃতিতে টিকে থাকার প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট একধরনের ভারসাম্য।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুনতাসীর আকাশ বলেন, অনেক পাখিকেই পিঁপড়ার ঢিবির কাছে ধূলি-গোসল করতে দেখা যায়। পিঁপড়ার নিঃসৃত ফরমিক অ্যাসিড পাখির পালককে বহিঃপরজীবী বা উকুন থেকে দূরে রাখে। ২০২২ সালে *জার্নাল অব অরনিথোলজি*তে প্রকাশিত এক গবেষণায়, জাপানে দামা, পেঙ্গা, চটকজাতীয় পাখিদের সাতটি ভিন্ন প্রজাতির পিঁপড়াকে পালকে নেওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে।

মুনতাসীর আকাশের মতে, কিছু রোগ আবার সেলফ লিমিটিং। যেমন পিজিয়ন-পক্স বাচ্চা কবুতর ও হরিয়ালের জন্য প্রাণঘাতী হলেও বড় পাখিদের জন্য তা নয়। কিছু পাখির অন্ত্র-নিঃসৃত জারক (এনজাইম) এত শক্তিশালী যে এনথ্রাক্সের জীবাণুকেও মেরে ফেলতে পারে। সব শকুনের এ সক্ষমতা আছে।

বুনো পাখিদের ঝুঁকি

তবে মানবসৃষ্ট কারণে ছড়ানো রোগজীবাণু নতুন নতুন হুমকি সৃষ্টি করে। স্বাভাবিকভাবে টিকে থাকার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলা

ভোলার ঢালচরের তারুয়া সমুদ্রসৈকতে খাবার খোঁজায় ব্যস্ত মুরগি চ্যাগা। ছবি : আ ন ম আমিনুর রহমান

পাখিদের জন্য এগুলো নতুন এবং হঠাৎ সৃষ্ট। শকুন পচাগলা খেতে পারে স্বাচ্ছন্দ্যে। কিন্তু স্টেরয়েড খাওয়ানো গবাদিপশুর মাংস খেলে কিডনি বিকল হয়ে শকুন দ্রুত মারা যায়।

বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করেন গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিচিকিৎসা অনুষদের সাবেক ডিন ও ভেটেরিনারি টিচিং হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ প্রাণিচিকিৎসক অধ্যাপক আ ন ম আমিনুর রহমান। তিনি বিজ্ঞানচিন্তাকে বলেন, হাঁস, রাজহাঁস ও অন্যান্য প্রজাতির বুনো জলচর পরিযায়ী পাখিরা অক্ষতিকারক ও স্বল্প প্রাণঘাতী রূপের এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস বহন করতে পারে। এই ভাইরাস বুনো পাখিকে অসুস্থ না করেই ছড়িয়ে পড়তে পারে এক পাখি থেকে অন্য পাখিতে। ভাইরাসটি যদি এমন কোনো হাঁস-মুরগির খামারে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে অনেক হাঁস-মুরগি একসঙ্গে গাদাগাদি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে, তাহলে ভাইরাসটি ক্ষতিকারক ও উচ্চ প্রাণঘাতী রূপে পরিবর্তিত (মিউটেশন) হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সংক্রমিত পাখি আক্রান্তের কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। অবশেষে মিউটেটেড ক্ষতিকারক ভাইরাসটি বুনো জলচর পাখিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং এদেরও মেরে ফেলতে পারে। এমনকি আগে যেসব সামুদ্রিক পাখি এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস-প্রতিরোধী ছিল (যেমন আলবাট্রস, পেঙ্গুইন), এরাও এখন বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে। আছে মহামারির ঝুঁকিতে। বলা যেতে পারে, প্রাকৃতিক বালাই-প্রতিরোধী পাখিরা মানবসৃষ্ট রোগে অস্তিত্ব-সংকটেই পড়ে গেছে।

আমরা প্রায়ই গণমাধ্যমে শুনি যে পরিযায়ী পাখিরা বার্ড ফ্লু ছড়ায়। তাই মানুষ ভুল করে বিশ্বাস করে যে বুনো পাখিরা হাঁস-মুরগির খামারে ভাইরাসের ক্ষতিকারক রূপ প্রবেশ করায়, যা পরে হাঁস-মুরগিকে মেরে ফেলতে ও মানুষকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। এ ভয় কখনো কখনো বুনো পাখিদের তাড়া করতে, এমনকি মেরে ফেলতে বাধ্য করে। বুনো পাখিদের তাড়িয়ে দেওয়া হিতে বিপরীত হতে পারে, যদি এরা ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে থাকে। কারণ, এরা সংক্রমণ ছড়াতে পারে। ভাইরাস ধ্বংস করার জন্য প্রাকৃতিক জলাভূমিতে জীবাণুনাশক স্প্রে করলে তা বাস্তুতন্ত্রের অনেক ক্ষতি করে। এটি ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার অকার্যকর উপায়। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রাদুর্ভাবের বিরুদ্ধে এ পদক্ষেপ অকেজো।

তাহলে উপায় কী? অধ্যাপক আমিনুর রহমানের মতে, বুনো পাখিদের এই রোগের হাত থেকে রক্ষা করার প্রধান উপায় হলো, হাঁস-মুরগির খামারে জৈব নিরাপত্তাব্যবস্থা উন্নত করা। জৈব নিরাপত্তা কী? এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ অন্যান্য জীবাণু খামারে প্রবেশ এবং বের হওয়া রোধ করে হাঁস-মুরগি ও মানুষকে রক্ষা করা। জৈব নিরাপত্তা হাঁস-মুরগি, বুনো পাখি, বন্য প্রাণী ও মানুষের জন্য সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে।

লেখক : সাংবাদিক

Job Solution BD Click Here to join the Channel
Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

কার্যকারণ

আব্দুল কাইয়ুম

পৃথিবী গোল কেন?

আমরা প্রায় সবাই জানি যে পৃথিবী গোল। শুধু পৃথিবী নয়, মহাশূন্যে বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ প্রায় সবই গোল। কিন্তু কেন? মহাশূন্যে ভাসমান বস্তু সব সময় একে অপরকে আকর্ষণ করে। মহাকর্ষ বলের কারণে এরা একে অপরের কাছে আসতে থাকে। কাছাকাছি এসে এরা একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। মহাশূন্যে ভাসমান অনেক কণা এভাবে জড়ো হয়ে ঘুরতে থাকে। ঘূর্ণমান বস্তু ক্রমেই গোলাকার ধারণ করে। পৃথিবী, মঙ্গল বুধ, শুক্র প্রভৃতি গ্রহ, চাঁদ বা অন্যান্য উপগ্রহ সব সময় ঘূর্ণমান ও গোলাকার। কারণ, পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ বল চারপাশের কণাগুলোকে কেন্দ্রের দিকে টেনে রাখে। ঘূর্ণমান বস্তু গোলাকার ধারণ করে বলেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ গোল।

দুই চোখ দিয়ে একই সঙ্গে দুদিকে দেখা যায় না কেন?

মানুষের চোখ স্টেরিওস্কোপিক দৃশ্য ধারণের উপযোগী বলে একই সঙ্গে দুই চোখে দুই দিকে দেখা সম্ভব হয় না। স্টেরিওস্কোপিক অর্থ হলো দুটি চোখ একই বস্তুকে দুই ভিন্ন কোণ থেকে দেখে এবং স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে দুই চোখে দেখা দৃশ্য সুসমন্বিতভাবে মস্তিষ্কে একটি দৃশ্য হিসেবে অনুভূত হয়। এর ফলে যেকোনো বস্তুর ত্রিমাত্রিক দৃশ্য আমরা দেখতে পাই। অর্থাৎ বস্তুর শুধু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নয়, এর বেধ বা গভীরতাও বুঝতে পারি। পাখি, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি প্রাণী এটা পারে না। তাদের দুই চোখ মাথার দুই দিকে থাকে। ফলে ওরা দুই চোখে দুই পাশ দেখতে পারে। যদিও আমাদের দুই চোখের পেশিতন্তু স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং চোখের মণি প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন দিকে নড়াচড়া করতে পারে, তবু চোখের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রিত হয় কেন্দ্রীয় মস্তিষ্কের একটি অংশে। এর ফলে দুটি চোখের একটি ফোকাল পয়েন্ট থাকে এবং দুই চোখ একেবারে আলাদাভাবে কোনো বস্তু দেখতে পারে না। দুই চোখের দুই পাশে আয়না রেখে যদি চোখকে দুই দিকে দেখার জন্য প্রলুব্ধ করা হয়, তখন মস্তিষ্ক সেটা প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত একটি ফোকাল পয়েন্টই কার্যকর হয়। আমরা স্টেরিওস্কোপিক দৃশ্য ধারণ করতে পারি বলে চলাফেরা করার সময় কোন গাড়িটি আগে, কোনটি পেছনে, কোনো গাছ বা বস্তুর কোনটি কত দূরে—এসব বুঝতে পারি। এই গুণটি না থাকলে আমাদের চলাফেরায় অনেক সমস্যা হতো।

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

ধাঁধা

রসায়নবিদ খুন

এক রসায়নবিদ তাঁর নিজের ল্যাবে খুন হয়েছেন। পুলিশ এসে ঘটনাস্থলে একটি কাগজ পেয়েছে। সে কাগজে কিছু রাসায়নিক পদার্থের নাম লেখা ছিল। যেমন নিকেল, কার্বন, অক্সিজেন, ল্যান্থানাম ও সালফার। খুনের দিন মাত্র তিনজন রসায়নবিদের ল্যাবে গিয়েছিলেন। তাঁর সহকর্মী বিজ্ঞানী অ্যানা, ভাইপো নিকোলাস, আর তাঁর স্ত্রী বেনিতা। সবকিছু দেখে পুলিশ খুনিকে ধরে ফেলল! কীভাবে বুঝল খুনি কে?

খুনি কে?

এক নারী খুন হয়েছেন। দেহটা পড়ে আছে রাস্তায়। পুলিশ সন্দেহ করছে নারীর স্বামী, ভাই ও বাবাকে। পুলিশ তাঁদের তিনজনকেই একটা মেসেজ পাঠাল। মেসেজটা হলো, 'আপনার স্ত্রী/বোন/মেয়ে খুন হয়েছেন। দয়া করে ঘটনাস্থলে আসুন।' মেসেজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী সেখানে পৌঁছালেন। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে খুনিকে ধরে ফেললেন। খুনি আসলে কে?

সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দিন বিজ্ঞানচিন্তার ঠিকানায়। সমাধানদাতা ২ জনের জন্য পুরস্কার হিসেবে রয়েছে ৫০০ টাকার বই। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ মে। খামের ওপর অবশ্যই 'গোয়েন্দা ধাঁধা' লিখবেন। উত্তরের সঙ্গে আপনার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন।

প্রশ্নোত্তরে বিজ্ঞান

উত্তর দিচ্ছেন সম্পাদক **আব্দুল কাইয়ুম**

প্রশ্ন. কোনো কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে চাঁদ কোথায় যাবে?

উত্তর : হয়তো শিগগিরই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবে না। কিন্তু কোনো কারণে এমন অঘটন যদি ঘটেই যায়, তাহলে আমাদের চাঁদের কী হবে? সে কি মহাকাশে এতিমের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? পৃথিবীর আকর্ষণে চাঁদ অনাদিকাল থেকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে চলেছে, হঠাৎ আকর্ষণ উধাও! এ অবস্থায় চাঁদ তার বর্তমান কক্ষপথের ট্যানজেন্ট বা স্পর্শক বরাবর সরলরেখায় আগের গতিতে ছুটতে থাকবে। এই চলার পথে যদি কখনো অন্য বড় কোনো বস্তুপিণ্ডের কাছাকাছি চলে যায়, তাহলে হয়তো তার একটা গতি হয়ে যাবে। নতুন সেই ভারী বস্তুর চারদিকে ঘুরতে থাকবে। অথবা কোনো এক সময় সূর্যের আকর্ষণে তার চারপাশে গ্রহের মতো নতুন কোনো কক্ষপথে পরিভ্রমণ করবে। অথবা মহাশূন্যে হারিয়ে যাবে। তবে মনে রাখতে হবে, এ রকম পরিস্থিতি অনেকটাই কাল্পনিক।

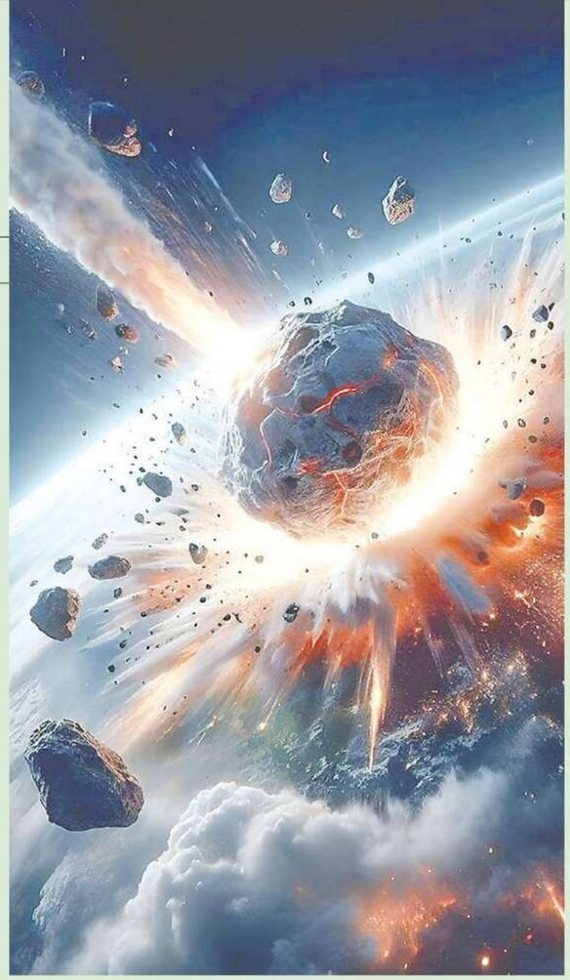

সুডোকু ৫০

সুডোকু বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় বুদ্ধিবৃত্তিক ধাঁধা। বুদ্ধির ব্যায়াম করতে, নিউরনের ক্ষমতা বাড়াতে কিংবা সময়কে আনন্দময় করতে এই জাপানি ধাঁধা সহায়ক হতে পারে। প্রতিটি কলাম ও সারিতে ১-৯ পর্যন্ত সব কটি অঙ্ক মাত্র একবার বসাতে হবে। তেমনি প্রতিটি ৩×৩ বর্গক্ষেত্রের ভেতরেও ১-৯ পর্যন্ত সব কটি অঙ্ক একবার বসবে। নিচের সুডোকুটি পূরণ করে পুরস্কার জিতে নিন।

সুডোকু ০১

	৫			২				৬
৩		৭						৮
					৬	৯		
					৩	৫	১	৯
		৯		১		২		
২	১	৮	৫					
		২	৪					
৭						৮		১
১				৯			৬	

সুডোকু ০২

						৬		
				৩			২	৪
	৫	৭	৬		৯			
	৪		৯			১		
৬	৩						৪	৮
		৭			২		৪	৭
			৯		৬	৭	৩	
৯	৩			২				
		৮						

সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দিন বিজ্ঞানচিন্তার ঠিকানায়। সমাধানদাতা একজন পাবেন ৫০০ টাকার বই। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ মে। খামের ওপর অবশ্যই 'সুডোকু ৫০' লিখবেন। উত্তরের সঙ্গে আপনার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন।

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

বলুন তো কতটি আম হাতে রইল?

আব্দুল কাইয়ুম

গণিতের প্রাথমিক কিছু নিয়ম জানলে অনেক কঠিন প্রশ্নের উত্তর চট করে বলে দেওয়া যায়। যেমন আমি বললাম, আপনি কিছু আম কিনুন। বন্ধুর কাছ থেকে একই সংখ্যক আম সংগ্রহ করুন। আমি আপনাকে আরও ২০টি আম দিলাম। মোট আমের অর্ধেক শিশুদের মধ্যে বিলিয়ে দিন। এবার বন্ধুর কাছ থেকে সংগ্রহ করা সমসংখ্যক আম ফিরিয়ে দিন। আপনার কাছে এখন ১০টি আম রইল। ঠিক কি না? বলুন তো, আমি কীভাবে উত্তরটি ঠিক ঠিক বলে দিলাম?

আপনি কতটি আম কিনেছেন, সেটা আমি জানি না। ধরে নিলাম 'ক' সংখ্যক আম কিনেছেন। বন্ধুর কাছ থেকে নিলেন আরও 'ক' সংখ্যক আম। আমি নিজে দিলাম 'খ' সংখ্যক আম। মোট আম হলো ২ক + খ। এবার অর্ধেক বিলিয়ে দেওয়ার পর থাকল ২ক + খ/২ সংখ্যক আম। বন্ধুর কাছ থেকে সংগ্রহ করা আম ফিরিয়ে দেওয়ার পর হলো (২ক + খ)/২ - ক = ক + খ/২ - ক = খ/২। অর্থাৎ আপনি যে সংখ্যক আম কিনে থাকুন না কেন, শেষ পর্যন্ত আমি যা দিলাম তার অর্ধেকই হবে উত্তর।

এ মাসের ধাঁধা

তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম একটি সংখ্যা থেকে ৪ বিয়োগ করলে বিয়োগফল ৪ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য, ৫ বিয়োগ করলে ৫ দিয়ে এবং ৬ বিয়োগ করলে ৬ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়। সংখ্যাটি কত?

গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

ধাঁধাটি ছিল এ রকম : $(৩৬^{x+২} + ৩৬^{x+২}) / ৩৬^{x+২}$ এই জটিল ভগ্নাংশটির মান কত?

উত্তর

২

কীভাবে উত্তর বের করলাম

ভগ্নাংশের সরল অঙ্কের প্রচলিত নিয়মেই উত্তর বের করা যায়। $(৩৬^{x+২} + ৩৬^{x+২}) \div ৩৬^{x+২} = (৬ + ৬) \div ৬ = ১২ \div ৬ = ২$

এপ্রিল সংখ্যার সঠিক ১০ উত্তরদাতা

মো. রাবিদ আল হাসান, দিঘাপতিয়া, নাটোর
আবদুল লতিফ, উত্তরা, ঢাকা
ফাহমিদা আক্তার, রায়েরবাগ, ঢাকা
ত্রিশাল রায়, পালপাড়া, নাটোর
সুমাইয়া, মোল্লাবাড়ী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
নাহিদ আক্তার, মতিঝিল, ঢাকা
হুমায়রা আক্তার, মিঠাপুকুর, রংপুর
যাহিদ হাসান, দক্ষিণখান, ঢাকা
স্নেহা তাসনীম, পাটোয়ারী, চাঁদপুর
জিহাদ হাসান, মিঠাপুকুর, রংপুর

পাঠক যখন লেখক

হয়তো আপনার ভেতরেই লুকিয়ে আছে আগামী দিনের বিজ্ঞান লেখক। হয়তো আপনি চাইছেনও কিছু একটা লিখতে। তবে দেরি কেন, ৫০০ শব্দের ভেতর লিখে ফেলুন বিজ্ঞান বা গণিতবিষয়ক কোনো ফিচার কিংবা মজার তথ্য। পাঠাতে পারেন বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের খবরও। তবে যা-ই লিখুন, সেটাতে যেন বৈজ্ঞানিক যুক্তি, ব্যাখ্যা এবং সূত্রটা থাকে ঠিকমতো। তারপর লেখাটা পাঠিয়ে দিন বিজ্ঞানচিন্তার দপ্তরে। মানসম্মত লেখাগুলো প্রকাশ করা হবে বিজ্ঞানচিন্তা অনলাইন বা প্রিন্ট সংস্করণে। লেখা পাঠাতে পারেন—editor@bigganchinta.com ঠিকানায়। অথবা লেখা অ্যাটাচ করে দিতে পারেন facebook.com/bigganchinta এই পেজের ইনবক্সেও। ডাকযোগে বা কুরিয়ারে লেখা পাঠানোর ঠিকানা : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫।

রসায়ন কুইজ ১০১

১. আমরা যে বাতাস গ্রহণ করি, তাতে সবচেয়ে বেশি কোন গ্যাস থাকে?
ক. অক্সিজেন
খ. নাইট্রোজেন
গ. কার্বন ডাই-অক্সাইড

২. কোন গ্যাস আগুনের শিখাকে নিভিয়ে দিতে পারে?
ক. অক্সিজেন
খ. হাইড্রোজেন
গ. কার্বন ডাই-অক্সাইড

৩. বৃষ্টির পানিতে সামান্য পরিমাণে কোন অ্যাসিড থাকে?
ক. সালফিউরিক অ্যাসিড
খ. নাইট্রিক অ্যাসিড
গ. কার্বনিক অ্যাসিড

রসায়ন কুইজ ১০০
১. গ. C
২. ক. লিথিয়াম
৩. খ. নাইট্রোজেন

পদার্থবিজ্ঞান কুইজ ১০১

১. কোন শক্তির কারণে আমাদের টেলিভিশন চলে?
ক. পেশিশক্তি
খ. বিদ্যুৎ-শক্তি
গ. সৌরশক্তি

২. কোনটির সাহায্যে দূরের জিনিস বড় দেখায়?
ক. আয়না
খ. দুরবিন
গ. চশমা

৩. কোন মাধ্যমে শব্দ সবচেয়ে দ্রুত চলে?
ক. বাতাস
খ. পানি
গ. কঠিন পদার্থ

পদার্থবিজ্ঞান কুইজ ১০০
১. ক. অপরিবর্তিত থাকে
২. ক. অ্যাম্পিয়ার
৩. খ. সময় ধীর হয়ে যাবে

মহাকাশবিজ্ঞান কুইজ ১০১

১. সম্প্রতি কোন নভোযান একটি গ্রহাণুর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার ছবি তুলেছে?
ক. জুনো
খ. লুসি
গ. নিউ হরাইজনস

২. মানুষের তৈরি কোন মহাকাশ যান প্রথম সৌরজগতের বাইরে গেছে?
ক. অ্যাপোলো ১১
খ. ভয়েজার ১
গ. স্পুতনিক ১

৩. মহাকাশে কোনো শব্দ শোনা যায় না কেন?
ক. বাতাস নেই
খ. অনেক বেশি নক্ষত্র
গ. খুব ঠান্ডা

মহাকাশবিজ্ঞান কুইজ ১০০
১. খ. ২৮৬ দিন
২. খ. প্লুটো
৩. গ. ২৭৪টি

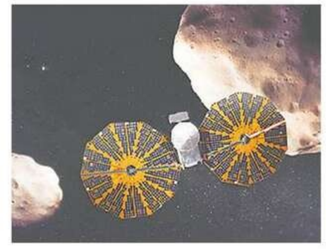

প্রতিটি কুইজের উত্তর আলাদা কাগজে লিখে পাঠাতে হবে। না হলে উত্তর গ্রহণযোগ্য হবে না। একই খামে একাধিক কুইজ পাঠানো যাবে। আগে কাগজে বড় করে কুইজের নাম লিখে পরে উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখতে হবে। খামের ওপর প্রথমে বড় করে লিখতে হবে 'কুইজ', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। প্রতিটি বিভাগে তিনজন করে কুইজ বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবেন রকমারি.com -এর সৌজন্যে ৩০০ টাকার বই। কুইজের উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ মে ২০২৫।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

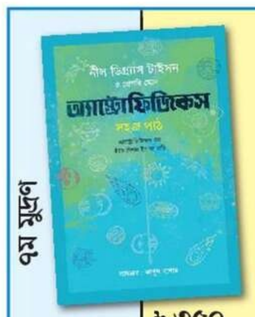

৭ম মুদ্রণ
৳ ৩৫০
অ্যাস্ট্রোফিজিকস : সহজ পাঠ
নীল ডিগ্র্যাস টাইসন ও গ্রেগরি মোন
ভাষান্তর : আবুল বাসার
জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে কৌতূহলজাগানিয়া সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে এ বইতে।
প্রথমা প্রকাশন
● ১৯ কারওয়ান বাজার। ০১৯৫৫৫৫২১৭৭
● ৪৩-৪৪ আজিজ মার্কেট, শাহবাগ। ০১৯৫৫৫৫২১৭৬
● শেফ'স টেবিল ইউনাইটেড সিটি মাদানি অ্যাভিনিউ, ঢাকা। ০১৭৩০ ০০০৬০০
অনলাইনে বই কিনুন : www.prothoma.com

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

জীববিজ্ঞান কুইজ ১০১

১. কোন কোষ আমাদের শরীরে রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করে?

ক. লোহিত রক্তকণিকা
খ. শ্বেত রক্তকণিকা
গ. স্নায়ুকোষ

২. নিচের কোনটি মৃত জৈব পদার্থকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত করে?

ক. উৎপাদক
খ. খাদক
গ. বিয়োজক

৩. উদ্ভিদের পাতায় ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, যার সাহায্যে গ্যাসের আদান-প্রদান হয়। এই ছিদ্রগুলোকে কী বলে?

ক. পত্ররন্ধ্র
খ. শিরা
গ. কাণ্ড

জীববিজ্ঞান কুইজ ১০০-এর উত্তর

১. খ. কার্বোহাইড্রেট
২. গ. কিডনি
৩. ক. প্লাটিলেট

প্রযুক্তি কুইজ ৭৩

১. কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বলা হয় কোনটিকে?

ক. সিপিইউ
খ. মনিটর
গ. কি-বোর্ড

২. টাচস্ক্রিন প্রযুক্তিতে প্রধানত কী ব্যবহৃত হয়?

ক. আলো
খ. চাপ
গ. তাপ

৩. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বর্তমানে কোন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে?

ক. মহাকাশ গবেষণা
খ. চিকিৎসাবিজ্ঞান
গ. গ্রাহক পরিষেবা

প্রযুক্তি কুইজ ৭২-এর উত্তর

১. খ. কাঠ
২. ক. গুণগত মানসম্পন্ন
৩. খ. ১৯৯১

বিজ্ঞানচিন্তার গ্রাহক হোন

এক বছর বা ছয় মাসের গ্রাহক হয়ে

ঘরে বসেই
সংগ্রহ করুন
বিজ্ঞানচিন্তা

গ্রাহক হতে ফোন করুন
নিচের নম্বরে
০১৭০৮৪১১৯৯৬

ডেলিভারি চার্জ ছাড়া ঘরে বসে পেতে চাইলে যোগাযোগ করুন :
prothoma.com

বিজ্ঞানচিন্তা

বিজ্ঞানচিন্তার এপ্রিল সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

গত সংখ্যার সব বিভাগের কুইজের উত্তর অনেকেরই সঠিক হয়েছে। তবে লটারির মাধ্যমে প্রতিটি বিভাগে ৩ জন করে ১৫ জন বিজয়ীকে বাছাই করা হয়েছে। বিজয়ী প্রত্যেকে পাবেন ৩০০ টাকার বই। বিজয়ীদের অভিনন্দন।

সৌজন্যে অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স বাংলাদেশের প্রথম সায়েন্স কিট

রসায়ন কুইজ ১০০

কেতিফা মুশাররাত
ইসলামবাগ, পঞ্চগড়

ইশরাত যাবীন
ইসলামবাগ পাড়া, মাগুরা

জিমু শামিম
আসকারদিঘি, চট্টগ্রাম

পদার্থবিজ্ঞান কুইজ ১০০

মোছা. শেফা খাতুন
খোকসা, কুষ্টিয়া

নুর হাসনাত
চূড়খাই, সদর ময়মনসিংহ

শাহ সামিহা
পল্লবী, ঢাকা

মহাকাশবিজ্ঞান কুইজ ১০০

সেলিম মোহাম্মদ আব্দুল
উত্তর বালুবাড়ী, দিনাজপুর

তুষার পাল
ময়নামতি মেডিকেল কলেজ, বারপাড়া

আহনাফ ইসলাম
হাফরাস্তা, নাটোর

জীববিজ্ঞান কুইজ ১০০

উৎসব সাহা
সুরমা, সিলেট

মাহিসা তাবাসসুম
কলেজ রোড, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

আজাদ শেখ
কাঁঠাল বাগান, ধানমন্ডি

প্রযুক্তি কুইজ ৭২

শামীম ইয়াসমিন
কাপাসিয়া, গাজীপুর

নাজাহ রাঈদ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

ঋতুপর্ণা হালদার
যশোর

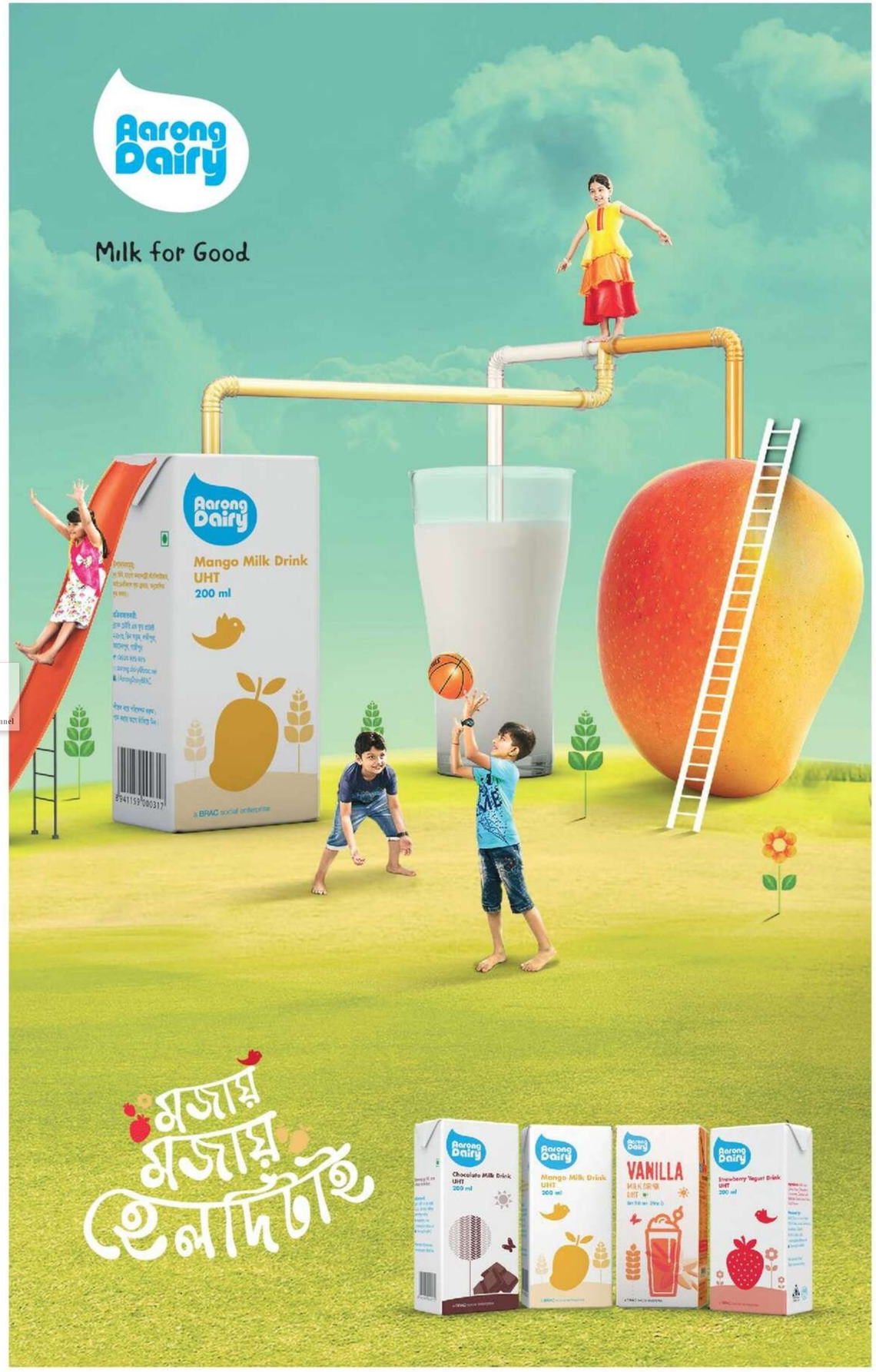

Job Solution BD Click Here to join the Channel

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD

Join here for more->https://t.me/job_solutionBD